রাশিয়ার চিঠি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রকাশক—রায়সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায়।

রাশিয়ার চিঠি

প্রথম সংস্করণ (৩১০০) বৈশাখ, ১৩৩৮ সাল

মূল্য ১৸৹ ও ২৷৹

শান্তিনিকেতন প্রেস। শান্তিনিকেতন, (বীরভূম)
রায়সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
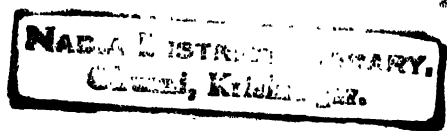
কল্যাণীয় শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ করকে

আশীর্ব্বাদ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন,

২৫শে বৈশাখ, ১৩৩৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাশিয়ার চিঠি

১

মস্কৌ

রাশিয়ায় অবশেষে আসা গেল। যা দেখ্‌চি আশ্চর্য্য ঠেক্‌চে। অন্য কোনো দেশের মতোই নয়। একেবারে মূলে প্রভেদ। আগাগোড়া সকল মানুষকেই এরা সমান ক'রে জাগিয়ে তুল্‌চে।

চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশি, তা'রাই বাহন; তাদের মানুষ হবার সময় নেই; দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তা'রা পালিত। সবচেয়ে কম খেয়ে কম প'রে কম শিখে বাকি সকলের পরিচর্য্যা করে; সকলের চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের

অসম্মান। কথায় কথায় তা'রা উপোসে মরে, উপরওয়ালাদের লাথি ঝাঁটা খেয়ে মরে—জীবনযাত্রার জন্য যত কিছু সুযোগ সুবিধে, সব-কিছুর থেকেই তা'রা বঞ্চিত। তা'রা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে—উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।

আমি অনেক দিন এদের কথা ভেবেচি, মনে হ'য়েচে এর কোনো উপায় নেই। এক দল তলায় না থাকলে আরেক দল উপরে থাক্‌তে পারে না, অথচ উপরে থাকার দরকার আছে। উপরে না থাক্‌লে নিতান্ত কাছের সীমার বাইরে কিছু দেখা যায় না;—কেবল-মাত্র জীবিকানির্ব্বাহ করার জন্যে তো মনুষ্যত্ব নয়। একান্ত জীবিকাকে অতিক্রম ক'রে তবেই তা'র সভ্যতা। সভ্যতার সমস্ত শ্রেষ্ঠ ফসল অবকাশের ক্ষেত্রে ফ'লেচে। মানুষের সভ্যতায় এক অংশে অবকাশ রক্ষা করার দরকার আছে। তাই ভাবতুম, যে-সব মানুষ শুধু অবস্থার গতিকে নয়, শরীর-মনের গতিকে নীচের তলায় কাজ ক'র্‌তে বাধ্য এবং সেই কাজেরই যোগ্য, যথাসম্ভব তাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য সুখ সুবিধার জন্যে চেষ্টা করা উচিত।

মুস্কিল এই, দয়া ক'রে কোনো স্থায়ী জিনিষ

করা চলে না; বাইরে থেকে উপকার ক'র্‌তে গেলে পদে পদে তা'র বিকার ঘটে। সমান হ'তে পার্‌লে তবেই সত্যকার সহায়তা সম্ভব হয়। যাই হোক, আমি ভালো ক'রে কিছুই ভেবে পাইনি—অথচ অধিকাংশ মানুষকে তলিয়ে রেখে, অমানুষ ক'রে রেখে তবেই সভ্যতা সমুচ্চ থাক্‌বে এ-কথা অনিবার্য্য ব'লে মেনে নিতে গেলে মনে ধিক্কার আসে।

ভেবে দেখো না, নিরন্ন ভারতবর্ষের অন্নে ইংলণ্ড পরিপুষ্ট হয়েচে। ইংলণ্ডের অনেক লোকেরই মনের ভাব এই যে ইংলণ্ডকে চিরদিন পোষণ করাই ভারতবর্ষের সার্থকতা। ইংলণ্ড বড়ো হ'য়ে উঠে মানবসমাজে বড়ো কাজ ক'র্‌চে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে চিরকালের মতো একটা জাতিকে দাসত্বে বদ্ধ ক'রে রেখে দিলে দোষ নেই। এই জাতি যদি কম খায় কম পরে তাতে কী যায় আসে, তবুও দয়া ক'রে তাদের অবস্থার কিছু উন্নতি করা উচিত এমন কথা তাদের মনে জাগে। কিন্তু একশো বছর হ'য়ে গেল, না পেলুম শিক্ষা, না পেলুম স্বাস্থ্য, না পেলুম সম্পদ।

প্রত্যেক সমাজের নিজের ভিতরেও এই একই কথা। যে-মানুষকে মানুষ সম্মান ক'র্‌তে পারে না

সে-মানুষকে মানুষ উপকার ক'র্‌তে অক্ষম। অন্তত যখনই নিজের স্বার্থে এসে ঠেকে তখনই মারামারি কাটাকাটি বেধে যায়। রাশিয়ায় একেবারে গোড়া ঘেঁষে এই সমস্যা সমাধান কর্‌বার চেষ্টা চ'ল্‌চে। তা'র শেষ-ফলের কথা এখনও বিচার কর্‌বার সময় হয় নি, কিন্তু আপাতত যা চোখে প'ড়্‌চে তা দেখে আশ্চর্য্য হ'চ্চি। আমাদের সকল সমস্যার সব চেয়ে বড়ো রাস্তা হ'চ্চে শিক্ষা। এতকাল সমাজের অধিকাংশ লোক শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত—ভারতবর্ষ তো প্রায় সম্পূর্ণ ই বঞ্চিত। এখানে সেই শিক্ষা কী আশ্চর্য্য উদ্যমে সমাজের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হ'চ্চে তা দেখ্‌লে বিস্মিত হ'তে হয়। শিক্ষার পরিমাণ শুধু সংখ্যায় নয়, তা'র সম্পূর্ণতায়, তা'র প্রবলতায়। কোনো মানুষই যাতে নিঃসহায় ও নিষ্কর্ম্মা হ'য়ে না থাকে এ জন্যে কী প্রচুর আয়োজন ও কী বিপুল উদ্যম। শুধু শ্বেত রাশিয়ার জন্যে নয়—মধ্য এসিয়ার অর্দ্ধ-সভ্য জাতের মধ্যেও এরা বন্যার মতো বেগে শিক্ষা বিস্তার ক'রে চ'লেচে —সায়ন্সের শেষ ফসল পর্য্যন্ত যাতে তা'রা পায়, এইজন্যে প্রয়াসের অন্ত নেই। এখানে থিয়েটারে অভিনয়ে বিষম ভিড়, কিন্তু যারা দেখ্‌চে তা'রা কৃষি ও

কর্ম্মীদের দলের। কোথাও এদের অপমান নেই। ইতিমধ্যে এদের যে দুই একটা প্রতিষ্ঠান দেখ্‌লুম সর্ব্বত্রই লক্ষ্য ক'রেচি এদের চিত্তের জাগরণ এবং আত্মমর্য্যাদার আনন্দ। আমাদের দেশের জনসাধারণের তো কথাই নেই—ইংলণ্ডে মজুর-শ্রেণীর সঙ্গে তুলনা ক'র্‌লে আকাশ-পাতাল তফাৎ দেখা যায়। আমরা শ্রীনিকেতনে যা ক'র্‌তে চেয়েচি এরা সমস্ত দেশ জুড়ে প্রকৃষ্টভাবে তাই ক'র্‌চে। আমাদের কর্ম্মীরা যদি কিছুদিন এখানে এসে শিক্ষা ক'রে যেতে পার্‌তো তাহ'লে ভারি উপকাব হ'তো। প্রতিদিনই আমি ভারতবর্ষের সঙ্গে এখানকার তুলনা ক'রে দেখি আর ভাবি কী হ'য়েচে আর কী হ'তে পার্‌তো। আমার আমেরিকান সঙ্গী ডাক্তার হ্যারি টিম্বর্স এখানকার স্বাস্থ্যবিধানের ব্যবস্থা আলোচনা ক'র্‌চে—তা'র প্রকৃষ্টতা দেখ্‌লে চমক লাগে—আর কোথায় প'ড়ে আছে রোগ-তপ্ত অভুক্ত হতভাগ্য নিরুপায় ভারতবর্ষ। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের অবস্থার সঙ্গে এদের জনসাধারণের অবস্থার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য ছিল—এই অল্পকালের মধ্যে দ্রুতবেগে বদলে গেচে—আমরা প'ড়ে আছি জড়তার পাঁকের মধ্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন।

এর মধ্যে যে গলদ কিছুই নেই তা বলিনে—গুরুতর গলদ আছে। সেজন্যে একদিন এদের বিপদ ঘটবে। সংক্ষেপে সে গলদ হ'চ্চে শিক্ষাবিধি দিয়ে এরা ছাঁচ বানিয়েচে—কিন্তু ছাঁচে-ঢালা মনুষ্যত্ব কখনো টেঁকে না—সজীব মনের তত্ত্বর সঙ্গে বিদ্যার তত্ত্ব যদি না মেলে তাহ'লে হয় একদিন ছাঁচ হবে ফেটে চূরমার, নয়, মানুষের মন যাবে ম'রে আড়ষ্ট হ'য়ে, কিম্বা কলের পুতুল হ'য়ে দাঁড়াবে।

এখানকার ছেলেদের মধ্যে বিভাগ ক'রে কর্ম্মের ভার দেওয়া হ'য়েচে দেখ্‌লুম, ওদের আবাসের ব্যবস্থা সম্বন্ধে একদল স্বাস্থ্য, একদল ভাণ্ডার ইত্যাদি নানা রকম তদারকের দায়িত্ব নেয়, কর্ত্তৃত্ব সবই ওদের হাতে, কেবল একজন পরিদর্শক থাকে। শান্তিনিকেতনে আমি চিরকাল এই সমস্ত নিয়ম প্রবর্ত্তন ক'র্‌তে চেষ্টা ক'রেচি—কেবলি নিয়মাবলী রচনা হ'য়েচে, কোনো কাজ হয়নি। তা'র অন্যতম কারণ হ'চ্চে, স্বভাবতই পাঠবিভাগের চরম লক্ষ্য হ'য়েচে পরীক্ষায় পাস করা, আর সব-কিছুই উপলক্ষ্য; অর্থাৎ হ'লে ভালোই, না হ'লেও ক্ষতি নেই—আমাদের অলস মন জবরদস্ত দায়িত্বের বাইরে কাজ বাড়াতে অনিচ্ছুক। তা ছাড়া

শিশুকাল থেকেই আমরা পুঁথিমুখস্থ বিদ্যাতেই অভ্যস্ত। নিয়মাবলী রচনা ক'রে কোনো লাভ নেই—নিয়ামকদের পক্ষে যেটা আন্তরিক নয় সেটা উপেক্ষিত না হ'য়ে থাকতে পারে না। গ্রামের কাজ ও শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে আমি যে-সব কথা এতকাল ভেবেচি এখানে তা'র বেশি কিছু নেই, কেবল আছে শক্তি, আছে উদ্যম, আর কার্য্য-কর্ত্তাদের ব্যবস্থাবুদ্ধি। আমার মনে হয় অনেকটাই নির্ভর করে গায়ের জোরের উপর—ম্যালেরিয়ায় জীর্ণ অপরিপুষ্ট দেহ নিয়ে সম্পূর্ণ বেগে কাজ করা দুঃসাধ্য—এখানকার শীতের দেশের লোকের হাড় শক্ত ব'লেই কাজ এমন ক'রে সহজে এগোয়—মাথা গুণতি ক'রে আমাদের দেশের কর্ম্মীদের সংখ্যা নির্ণয় করা ঠিক নয়—তা'রা পূরো একখানা মানুষ নয়।

ইতি ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৩০

২

মস্কৌ

স্থান রাশিয়া। দৃশ্য, মস্কৌয়ের উপনগরীতে একটি প্রাসাদভবন। জানলার ভিতর দিয়ে চেয়ে দেখি,

দিক্‌প্রান্ত পর্য্যন্ত অরণ্যভূমি, সবুজ রঙের ঢেউ উঠেচে, ঘন সবুজ, ফিকে সবুজ, বেগ্‌নির সঙ্গে মেশামেশি সবুজ, হল্‌দের আমেজ-দেওয়া সবুজ। বনের শেষ সীমায় বহুদূরে গ্রামের কুটীরশ্রেণী। বেলা প্রায় দশটা, আকাশে স্তরে স্তরে মেঘ ক'রেচে, অবৃষ্টিসংরম্ভ সমারোহ, বাতাসে ঋজুকায়া পপ্‌লার গাছের শিখরগুলি দোদুল্যমান।

মস্কৌয়েতে কয়দিন যে-হোটেলে ছিলুম, তা'র নাম গ্র্যাণ্ড হোটেল। বাড়িটা মস্ত, কিন্তু অবস্থা অতি দরিদ্র। যেন ধনীর ছেলে দেউলে হ'য়ে গেচে। সাবেক কালের সাজসজ্জা কতক গেচে বিকিয়ে, কতক গেচে ছিঁড়ে, তালি-দেওয়ারও সঙ্গতি নেই, ময়লা হ'য়ে আছে, ধোবার বাড়ির সম্পর্ক বন্ধ। সমস্ত শহরেরই অবস্থা এই রকম—একান্ত অপরিচ্ছন্নতার ভিতর দিয়েও নবাবী আমলের চেহারা দেখা যাচ্চে, যেন ছেঁড়া জামাতেও সোনার বোতাম লাগানো, যেন ঢাকাই ধুতি রিফু করা। আহারে ব্যবহারে এমন সর্ব্বব্যাপী নির্ধনতা য়ুরোপের আর কোথাও দেখা যায় না। তা'র প্রধান কারণ, আর আর সব জায়গায় ধনী দরিদ্রের প্রভেদ থাকাতে ধনের পুঞ্জীভূত রূপ সব চেয়ে বড়ো ক'রে চোখে পড়ে—সেখানে দারিদ্র্য থাকে যবনিকার আড়ালে

নেপথ্যে ; সেই নেপথ্যে সব এলোমেলো, নোংরা, অস্বাস্থ্যকর, দুঃখে দুর্দ্দশায়, দুষ্কর্ম্মে নিবিড় অন্ধকার। কিন্তু বাইরে থেকে গিয়ে আমরা যেখানে বাসা পাই সেখানকার জানলা দিয়ে যা-কিছু দেখতে পাই সমস্তই সুভদ্র, শোভন, সুপরিপুষ্ট। এই সমৃদ্ধি যদি সমানভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যেতো তাহ'লে তখনই ধরা প'ড়্তো, দেশের ধন এত কিছু বেশি নয় যাতে সকলেরই ভাত কাপড় যথেষ্ট পরিমাণে জোটে। এখানে ভেদ নেই ব'লেই, ধনের চেহারা গেচে ঘুচে, দৈন্যেরও কুশ্রীতা নেই, আছে অকিঞ্চনতা। দেশ-জোড়া এই অধন আর কোথাও দেখিনে ব'লেই প্রথমেই এই আমাদের খুব চোখে পড়ে। অন্যদেশে যাদের আমরা জনসাধারণ বলি, এখানে তা'রাই একমাত্র।

মস্কৌয়ের রাস্তা দিয়ে নানা লোক চ'লেচে। কেউ ফিটফাট নয়, দেখ্‌লেই বোঝা যায় অবকাশভোগীর দল একেবারে অন্তর্দ্ধান ক'রেচে, সকলকেই স্বহস্তে কাজকর্ম্ম ক'রে দিনপাত ক'র্‌তে হয়, বাবুগিরির পালিশ কোনো জায়গাতেই নেই। ডাক্তার পেট্রোভ ব'লে এক ভদ্রলোকের বাড়ি যেতে হ'য়েছিলো, তিনি এখানকার একজন সম্মানী লোক, উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। যে-

বাড়িতে তাঁর আপিস সেটা সেকালের একজন বড়োলোকের বাড়ি, কিন্তু ঘরে আসবাব অতি সামান্য, পারিপাট্যের কোনো লক্ষণ নেই—নিষ্কার্পেট মেঝের এক কোণে যেমন-তেমন একখানা টেবিল; সবসুদ্ধ, পিতৃবিয়োগে ধোপানাপিতবর্জ্জিত অশৌচদশার মতো শয্যাসনশূন্য ভাব, যেন বাইরের লোকের কাছে সামাজিকতা রক্ষার কোনো দায় নেই। আমার বাসায় আহারাদির যে ব্যবস্থা তা গ্র্যাণ্ড হোটেল নামধারী পান্থাবাসের পক্ষে নিতান্তই অসঙ্গত। কিন্তু এজন্যে কোনো কুণ্ঠা নেই—কেননা সকলেরই এক দশা।

আমাদের বাল্যকালের কথা মনে পড়ে। তখনকার জীবনযাত্রা ও তা'র আয়োজন এখনকার তুলনায় কতই অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু সে-জন্যে আমাদের কারো মনে কিছুমাত্র সঙ্কোচ ছিল না; তা'র কারণ, তখনকার সংসারযাত্রার আদর্শে অত্যন্ত বেশি উঁচুনীচু ছিল না—সকলেরই ঘরে একটা মোটামোটি রকমের চালচলন ছিল—তফাৎ যা ছিল তা বৈদগ্ধ্যের অর্থাৎ গান বাজনা পড়াশুনো ইত্যাদি নিয়ে। তাছাড়া ছিল কৌলিক রীতির পার্থক্য অর্থাৎ ভাষা ভাব ভঙ্গী আচারবিচারগত বিশেষত্ব। কিন্তু তখন আমাদের

আহার-বিহার ও সকল প্রকার উপকরণ যা ছিল তা দেখ্‌লে এখনকার সাধারণ মধ্যবিত্ত লোকদের মনেও অবজ্ঞা জাগ্‌তে পার্‌তো।

ধনগত বৈষম্যের বড়াই আমাদের দেশে এসেচে পশ্চিম মহাদেশ থেকে। এক সময়ে আমাদের দেশে যখন হাল আমলের আপিসবিহারী ও ব্যবসাদারদের ঘরে নতুন টাকার আমদানি হ'লো, তখন তা'রা বিলিতী বাবুগিরির চলন সুরু ক'রে দিলে। তখন থেকে আসবাবের মাপেই ভদ্রতার পরিমাপ আরম্ভ হ'য়েচে। তাই আমাদের দেশেও আজকাল কুলশীল রীতিনীতি বুদ্ধিবিদ্যা সমস্ত ছাপিয়ে চোখে পড়ে ধনের বিশিষ্টতা। এই বিশিষ্টতার গৌরবই মানুষের পক্ষে সব চেয়ে অগৌরব। এরই ইতরতা যাতে মজ্জার মধ্যে প্রবেশ না করে, সেজন্যে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

এখানে এসে যেটা সব চেয়ে আমার চোখে ভালো লেগেচে সে হ'চ্চে এই ধন-গরিমার ইতরতার সম্পূর্ণ তিরোভাব। কেবলমাত্র এই কারণেই এদেশে জনসাধারণের আত্মমর্য্যাদা এক মুহূর্ত্তে অবারিত হ'য়েচে। চাষাভূষো সকলেই আজ অসম্মানের বোঝা ঝেড়ে ফেলে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেচে।

এইটে দেখে আমি যেমন বিস্মিত তেমনি আনন্দিত হয়েচি। মানুষে মানুষে ব্যবহার কী আশ্চর্য্য সহজ হ'য়ে গেচে। অনেক কথা বল্‌বার আছে, বল্‌বার চেষ্টা ক'র্‌বো—কিন্তু এই মুহূর্ত্তে আপাতত বিশ্রাম কর্‌বার দরকার হ'য়েচে। অতএব জানলার সাম্‌নে লম্বা কেদারার উপর হেলান দিয়ে ব'স্‌বো, পায়ের উপর একটা কম্বল টেনে দেবো—তা'র পরে চোখ যদি বুজে আসতে চায় জোর ক'রে টেনে রাখ্‌তে চেষ্টা ক'র্‌বো না। ইতি ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৩০।

৩

মস্কৌ

বহুকাল গত হ'লো তোমাদের উভয়কে পত্র লিখেছিলুম। তোমাদের সম্মিলিত নৈঃশব্দ্য থেকে অনুমান করি সেই যুগলপত্র কৈবল্য লাভ ক'রেচে। এমনতরো মহতী বিনষ্টি ভারতীয় ডাকঘরে আজকাল মাঝে মাঝে ঘটেচে ব'লে শঙ্কা করি। এই কারণেই আজকাল চিঠি লিখ্‌তে উৎসাহ বোধ করিনে। অন্তত তোমাদের দিক্ থেকে সাড়া না পেলে চুপ ক'রে

যাই। নিঃশব্দ রাত্রির প্রহরগুলোকে দীর্ঘ ব'লে মনে হয়—তেমনিতরোই নিশ্চিঠি কাল কল্পনায় অত্যন্ত লম্বা হয়ে ওঠে। তাই থেকে থেকে মনে হয় যেন লোকান্তরপ্রাপ্তি হয়েচে। তাই পাঁজি গেচে বদল হ'য়ে, ঘড়ি বাজচে লম্বা তালে। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের মতো আমার দেশে-যাবার সময়কে যতই টান মারচে ততই অফুরান হ'য়ে বেড়ে চ'লেচে। যেদিন ফিরবো সেদিন নিশ্চিতই ফিরবো—আজকের দিন যেমন অব্যবহিত নিকটে সেদিনও তেমনিই নিকটে আসবে, এই মনে ক'রে সান্ত্বনার চেষ্টা করি।

তা হোক্, আপাতত রাশিয়ায় এসেচি—না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকতো। এখানে এরা যা কাণ্ড ক'রেচে তা'র ভালোমন্দ বিচার করবার পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথমেই মনে হয়, কী অসম্ভব সাহস! সনাতন ব'লে পদার্থটা মানুষের অস্থিমজ্জায় মনে প্রাণে হাজারখানা হ'য়ে আঁকড়ে আছে, তা'র কত দিকে কত মহল, কত দরজায় কত পাহারা, কত যুগ থেকে কত ট্যাক্‌সো আদায় ক'রে তা'র তহবিল হ'য়ে উঠেচে পর্ব্বতপ্রমাণ। এরা তাকে একেবারে জটে ধ'রে টান মেরেচে—ভয় ভাবনা সংশয় কিছুই মনে

নেই। সনাতনের গদি দিয়েচে ঝাঁটিয়ে, নূতনের জন্যে একেবারে নূতন আসন বানিয়ে দিলে। পশ্চিম মহাদেশ বিজ্ঞানের জাদুবলে দুঃসাধ্য সাধন করে, দেখে মনে মনে তারিফ করি। কিন্তু এখানে যে প্রকাণ্ড ব্যাপার চল্‌চে সেটা দেখে আমি সবচেয়ে বেশি বিস্মিত হয়েচি। শুধু যদি একটা ভীষণ ভাঙ্‌চুরের কাণ্ড হ'তো তাতে তেমন আশ্চর্য্য হতুম না, কেননা নাস্তানাবুদ কর্‌বার শক্তি এদের যথেষ্ট আছে; কিন্তু দেখতে পাচ্চি বহুদূরব্যাপী একটা ক্ষেত্র নিয়ে এরা একটা নূতন জগৎ গড়ে তুল্‌তে কোমর বেঁধে লেগে গেচে। দেরি সইচে না, কেননা জগৎ জুড়ে এদের প্রতিকূলতা, সবাই এদের বিরোধী—যত শীঘ্র পারে এদের খাড়া হ'য়ে দাঁড়াতে হবে—হাতে হাতে প্রমাণ ক'রে দিতে হবে এরা যেটা চাচ্চে সেটা ভুল নয়, ফাঁকি নয়, হাজার বছরের বিরুদ্ধে দশ পনেরো বছর জিৎবে ব'লে পণ ক'রেচে। অন্য দেশের তুলনায় এদের অর্থের জোর অতি সামান্য, প্রতিজ্ঞার জোর দুর্দ্ধর্ষ।

এই যে বিপ্লবটা ঘটলো এটা রাশিয়াতে ঘটবে ব'লেই অনেক কাল থেকে অপেক্ষা ক'রছিলো। আয়োজন

কতদিন থেকেই চল্‌চে। খ্যাত অখ্যাত কত লোক কত কাল থেকেই প্রাণ দিয়েচে, অসহ্য দুঃখ স্বীকার ক'রেচে। পৃথিবীতে বিপ্লবের কারণ বহুদূর পর্য্যন্ত ব্যাপক হ'য়ে থাকে, কিন্তু এক একটা জায়গায় ঘনীভূত হ'য়ে ওঠে। সমস্ত শরীরের রক্ত দূষিত হ'য়ে উঠলেও এক একটা দুর্ব্বল জায়গায় ফোড়া হ'য়ে লাল হ'য়ে ওঠে। যাদের হাতে ধন, যাদের হাতে ক্ষমতা, তাদের হাত থেকে নির্ধন ও অক্ষমেরা এই রাশিয়াতেই অসহ্য যন্ত্রণা বহন ক'রেচে। দুই পক্ষের মধ্যে একান্ত অসাম্য অবশেষে প্রলয়ের মধ্যে দিয়ে এই রাশিয়াতেই প্রতিকার-সাধনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত।

একদিন ফরাসী-বিদ্রোহ ঘটেছিলো এই অসাম্যের তাড়নায়। সেদিন সেখানকার পীড়িতেরা বুঝেছিলো এই অসাম্যের অপমান ও দুঃখ বিশ্বব্যাপী। তাই সেদিনকার বিপ্লবে সাম্য সৌভ্রাত্র্য ও স্বাতন্ত্র্যের বাণী স্বদেশের গণ্ডী পেরিয়ে উঠে ধ্বনিত হয়েছিলো। কিন্তু টিঁকলো না। এদের এখানকার বিপ্লবের বাণীও বিশ্ববাণী। আজ পৃথিবীতে অন্তত এই একটা দেশের লোক স্বাজাতিক স্বার্থের উপরেও সমস্ত মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা ক'রচে। এ বাণী চিরদিন টিঁকবে কি না কেউ বল্‌তে পারে না।

কিন্তু স্বজাতির সমস্যা সমস্ত মানুষের সমস্যার অন্তর্গত এই কথাটা বর্ত্তমান যুগের অন্তর্নিহিত কথা। এ'কে স্বীকার ক'রতেই হবে।

এই যুগে বিশ্ব-ইতিহাসের রঙ্গভূমির পর্দ্দা উঠে গেচে। এতকাল যেন আড়ালে আড়ালে রিহার্স্যাল চল্‌ছিলো, টুক্‌রো টুক্‌রো ভাবে, ভিন্ন ভিন্ন কামরায়। প্রত্যেক দেশের চারিদিকে বেড়া ছিল। বাহির থেকে আনাগোনা করবার পথ একেবারে ছিল না তা নয়, কিন্তু বিভাগের মধ্যে মানব-সংসারের যে-চেহারা দেখেচি আজ তা দেখিনে। সেদিন দেখা যাচ্ছিলো একটি একটি গাছ, আজ দেখচি অরণ্য। মানব-সমাজের মধ্যে যদি ভার-সামঞ্জস্যের অভাব ঘ'টে থাকে সেটা আজ দেখা দিচ্চে পৃথিবীর একদিক থেকে আর একদিক পর্য্যন্ত। এমন বিরাট ক'রে দেখতে পাওয়া কম কথা নয়।

টোকিয়োতে যখন কোরীয় যুবককে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলুম, তোমাদের দুঃখটা কী? সে বল্‌লে, আমাদের কাঁধে চেপেচে মহাজনের রাজত্ব, আমরা তাদের মুনফার বাহন। আমি প্রশ্ন ক'র্‌লুম, যে কারণেই হোক তোমরা যখন দুর্ব্বল তখন এই বোঝা

পায়োনিয়র্স কম্যুনে দু'জন পায়োনিয়র ছাত্র ও রবীন্দ্রনাথ

নিজের জোরে ঝেড়ে ফেল্‌বে কী উপায়ে ? সে ব'ল্‌লে নিরুপায়ের দল আজ পৃথিবী জুড়ে, দুঃখে তাদের মেলাবে—যারা ধনী যারা শক্তিমান তা'রা নিজের নিজের লোহার সিন্ধুক ও সিংহাসনের চারদিকে পৃথক হ'য়ে থাকবে, তা'রা কখনো মিলতে পারবে না। কোরিয়ার জোর হ'চ্চে তা'র দুঃখের জোর।

দুঃখী আজ সমস্ত মানুষের রঙ্গভূমিতে নিজেকে বিরাট ক'রে দেখতে পাচ্চে, এইটে মস্ত কথা। আগেকার দিনে নিজেদের বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখেচে ব'লেই কোনোমতে নিজের শক্তিরূপ দেখ্‌তে পায়নি—অদৃষ্টের উপর ভর ক'রে সব সহ্য ক'রেচে। আজ অত্যন্ত নিরুপায়ও অন্তত সেই স্বর্গরাজ্য কল্পনা ক'র্‌তে পার্‌চে যে-রাজ্যে পীড়িতের পীড়া যায়, অপমানিতের অপমান ঘোচে। এই কারণেই সমস্ত পৃথিবীতেই আজ দুঃখজীবীরা ন'ড়ে উঠেচে।

যারা শক্তিমান তা'রা উদ্ধত। দুঃখীদের মধ্যে আজ যে-শক্তির প্রেরণা সঞ্চারিত হ'য়ে তাদের অস্থির ক'রে* তুলচে তাকে বলশালীরা বাইরে থেকে ঠেকাবার

* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

চেষ্টা ক'র্‌চে—তা'র দূতদের ঘরে ঢুক্‌তে দিচ্চে না, তাদের কণ্ঠ দিচ্চে রুদ্ধ ক'রে। কিন্তু আসল যাকে সব চেয়ে ওদের ভয় করা উচিত ছিল সে হ'চ্চে দুঃখীর দুঃখ—কিন্তু তাকেই এরা চিরকাল সব চেয়ে অবজ্ঞা ক'র্‌তে অভ্যস্ত। নিজের মুনফার খাতিরে সেই দুঃখকে এরা বাড়িয়ে চ'ল্‌তে ভয় পায় না, হতভাগ্য চাষীকে দুর্ভিক্ষের কবলের মধ্যে ঠেসে ধ'রে শতকরা দুশো তিনশো হারে মুনফা ভোগ ক'র্‌তে এদের হৃৎকম্প হয় না। কেননা সেই মুনফাকেই এরা শক্তি ব'লে জানে। কিন্তু মানুষের সমাজে সমস্ত আতিশয্যের মধ্যেই বিপদ, সে-বিপদকে কখনোই বাইরে থেকে ঠেকানো যায় না। অতিশয় শক্তি অতিশয় অশক্তির বিরুদ্ধে চিরদিন নিজেকে বাড়িয়ে চ'ল্‌তেই পারে না। ক্ষমতাশালী যদি আপন শক্তিমদে উন্মত্ত হ'য়ে না থাক্‌তো তাহ'লে সব চেয়ে ভয় ক'রতো এই অসাম্যের বাড়াবাড়িকে—কারণ অসামঞ্জস্য মাত্রই বিশ্ব-বিধির বিরুদ্ধে।

মস্কৌ থেকে যখন নিমন্ত্রণ এলো তখনো বলশেভিক-দের সম্বন্ধে আমার মনে স্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না। তাদের সম্বন্ধে ক্রমাগতই উল্টো উল্টো কথা

শুনেচি। আমার মনে তাদের বিরুদ্ধে একটা খট্‌কা ছিল। কেননা গোড়ায় ওদের সাধনা ছিল জবরদস্তির সাধনা। কিন্তু একটা জিনিষ লক্ষ্য ক'রে দেখলুম ওদের প্রতি বিরুদ্ধতা য়ুরোপে যেন অনেকটা ক্ষীণ হ'য়ে এসেচে। আমি রাশিয়াতে আস্‌চি শুনে অনেক লোকেই আমাকে উৎসাহ দিয়েচে। এমন কি অনেক ইংরেজের মুখেও ওদের প্রশংসা শুনেচি। অনেকে ব'লেচে ওরা অতি আশ্চর্য্য একটা পরীক্ষায় প্রবৃত্ত।

আবার অনেকে আমাকে ভয় দেখিয়েচে—কিন্তু প্রধান ভয়ের বিষয় আরামের অভাব, ব'লেচে আহারাদি সমস্তই এমন মোটা রকম, যে, আমি তা সহ্য ক'র্‌তে পারবো না। তা ছাড়া এমন কথাও অনেকে ব'লেচে আমাকে যা এরা দেখাবে তা'র অধিকাংশই বানানো। এ কথা মান্‌তেই হবে, আমার বয়সে আমার মতো শরীর নিয়ে রাশিয়ায় ভ্রমণ দুঃসাহসিকতা। কিন্তু পৃথিবীতে যেখানে সব চেয়ে বড়ো ঐতিহাসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান সেখানে নিমন্ত্রণ পেয়েও না আসা আমার পক্ষে অমার্জ্জনীয় হ'তো।

তা ছাড়া আমার কানে সেই কোরীয় যুবকের

কথাটা বাজ্‌ছিলো। মনে মনে ভাবছিলুম ধনশক্তিতে দুর্জ্জয় পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাঙ্গণদ্বারে ঐ রাশিয়া আজ নির্ধনের শক্তি-সাধনার আসন পেতেচে সমস্ত পশ্চিম মহাদেশের ভ্রূকুটিকুটিল কটাক্ষকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে, এটা দেখবার জন্যে আমি যাবো না তো কে যাবে? ওরা শক্তিশালীর শক্তিকে, ধনশালীর ধনকে বিপর্য্যস্ত ক'রে দিতে চায়, তাতে আমরা ভয় ক'র্‌বো কিসের, রাগই ক'র্‌বো বা কেন? আমাদের শক্তিই বা কী, ধনই বা কত? আমরা তো জগতের নিরন্ন নিঃসহায়দের দলের।

যদি কেউ বলে দুর্ব্বলের শক্তিকে উদ্বোধিত কর্‌বার জন্যেই তা'রা পণ ক'রেচে তাহ'লে আমরা কোন্ মুখে ব'ল্‌বো, যে, তোমাদের ছায়া মাড়াতে নেই? তা'রা হয়তো ভুল ক'র্‌তে পারে—তাদের প্রতিপক্ষেরাও যে ভুল ক'র্‌বে না তা নয়। কিন্তু আমাদের বলবার আজ সময় এসেচে, যে, অশক্তের শক্তি এখনই যদি না জাগে তাহ'লে মানুষের পরিত্রাণ নেই, কারণ শক্তিমানের শক্তিশেল অতিমাত্র প্রবল হ'য়ে উঠেচে—এতদিন ভূলোক উত্তপ্ত হ'য়ে উঠেছিলো, আজ আকাশকে পর্য্যন্ত পাপে কলুষিত ক'রে তুল্‌লে; নিরুপায় আজ অতিমাত্র নিরুপায়—সমস্ত

সুযোগ সুবিধা আজ কেবল মানব সমাজের এক পাশে পুঞ্জীভূত, অন্য পাশে নিঃসহায়তা অন্তহীন।

এরই কিছুদিন পূর্ব্বে থেকে ঢাকার অত্যাচারের কাহিনী আমার মনের মধ্যে তোলপাড় ক'রছিলো। কী সব অমানুষিক নিষ্ঠুরতা, অথচ ইংলণ্ডের খবরের কাগজে তা'র খবরই নেই—এখানকার মোটর গাড়ির দুর্য্যোগে দুটো একটা মানুষ ম'লে তা'র খবর এদেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু আমাদের ধন প্রাণ মান কী অসম্ভব সস্তা হ'য়ে গেচে! যারা এত সস্তা তাদের সম্বন্ধে কখনো সুবিচার হ'তেই পারে না।

আমাদের নালিশ পৃথিবীর কানে ওঠবার জো নেই, সমস্ত রাস্তা বন্ধ। অথচ আমাদের বিরুদ্ধ বচন জগতে ব্যাপ্ত করবার সকল প্রকার উপায় এদের হাতে। আজকের দিনে দুর্ব্বল জাতির পক্ষে এও একটি প্রবলতম গ্লানির বিষয়। কেননা আজকের দিনের জনশ্রুতি সমস্ত জগতের কাছে ঘোষিত হয়, বাক্যচালনার যন্ত্রগুলো যে-সব শক্তিমান্ জাতির হাতে তা'রা অখ্যাতির এবং অপযশের আড়ালে অশক্ত-জাতীয়দের বিলুপ্ত ক'রে রাখ্তে পারে। পৃথিবীর

লোকের কাছে এ-কথা প্রচারিত, যে, আমরা হিন্দু মুসলমানে কাটাকাটি মারামারি করি, অতএব ইত্যাদি। কিন্তু য়ুরোপেও একদা সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কাটাকাটি মারামারি চ'ল্‌তো—গেল কী উপায়ে? কেবলমাত্র শিক্ষা-বিস্তারের দ্বারা। আমাদের দেশেও সেই উপায়েই যেতো। কিন্তু শতাধিক বৎসরের ইংরেজ শাসনের পরে দেশে শতকরা পাঁচজনের কপালে শিক্ষা জুটেচে, সে-শিক্ষাও শিক্ষার বিড়ম্বনা।

অবজ্ঞার কারণকে দূর কর্‌বার চেষ্টা না ক'রে লোকের কাছে প্রমাণ করা, যে, আমরা অবজ্ঞার যোগ্য, এইটে হ'চ্চে আমাদের অশক্তির সব চেয়ে বড়ো ট্যাক্‌সো। মানুষের সকল সমস্যা সমাধানের মূলে হ'চ্চে তা'র সুশিক্ষা। আমাদের দেশে তা'র রাস্তা বন্ধ, কারণ law and order আর কোনো উপকারের জন্যে জায়গা রাখলে না, তহবিল একেবারে ফাঁকা। আমি দেশের কাজের মধ্যে একটি কাজকেই শ্রেষ্ঠ ব'লে মেনে নিয়েছিলুম ;—জনসাধারণকে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠা দেবার শিক্ষা দেবো ব'লে এতকাল ধ'রে আমার সমস্ত সামর্থ্য দিয়েচি। এজন্যে কর্ত্তৃপক্ষের আনুকূল্যও আমি প্রত্যাখ্যান ক'র্‌তে চাইনি, প্রত্যাশাও ক'রেচি—কিন্তু

তুমি জানো কতটা ফল পেয়েচি। বুঝ্‌তে পেরেচি হবার নয়! মস্ত আমাদের পাপ, আমরা অশক্ত।

তাই যখন শুন্‌লুম রাশিয়াতে জনসাধারণের শিক্ষা প্রায় শূন্য অঙ্ক থেকে প্রভূত পরিমাণে বেড়ে গেচে, তখন মনে মনে ঠিক ক'র্‌লুম ভাঙা শরীর আরো যদি ভাঙে তো ভাঙুক, ওখানে যেতেই হবে। এরা জেনেচে অশক্তকে শক্তি দেবার একটি মাত্র উপায় শিক্ষা—অন্ন স্বাস্থ্য শান্তি সমস্তই এরই 'পরে নির্ভর করে। ফাঁকা law and order নিয়ে না ভরে পেট না ভরে মন। অথচ তা'র দাম দিতে গিয়ে সর্ব্বস্ব বিকিয়ে গেল।

আধুনিক ভারতবর্ষের আবহাওয়ায় আমি মানুষ, তাই এতকাল আমার মনে দৃঢ় ধারণা ছিল, প্রায় তেত্রিশ কোটি মূর্খকে বিদ্যাদান করা অসম্ভব ব'ল্‌লেই হয়, এজন্য আমাদের মন্দ ভাগ্য ছাড়া আর কাউকে বুঝি দোষ দেওয়া চলে না। যখন শুনেছিলুম এখানে চাষী ও কর্ম্মীদের মধ্যে শিক্ষা হূহু ক'রে এগিয়ে চ'লেচে আমি ভেবেছিলুম সে-শিক্ষা বুঝি সামান্য একটুখানি পড়া ও লেখা ও অঙ্ককষা—কেবলমাত্র মাথা গুনতিতেই তা'র গৌরব। সেও কম কথা নয়।

আমাদের দেশে তাই হ'লেই রাজাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে বাড়ি চ'লে যেতুম। কিন্তু এখানে দেখলুম, বেশ পাকারকমের শিক্ষা, মানুষ ক্ল'রে তোলবার উপযুক্ত, নোট মুখস্থ ক'রে এম-এ পাশ করবার মতন নয়।

কিন্তু এসব কথা আর একটু বিস্তারিত ক'রে পরে লিখবো, আজ আর সময় নেই। আজই সন্ধ্যাবেলায় বর্লিন অভিমুখে যাত্রা ক'রবো। তা'র পরে ৩রা অক্টোবর আটলান্টিক পাড়ি দেবো—কতদিনের মেয়াদ্ আজও নিশ্চিত ক'রে ব'ল্‌তে পারচিনে।

কিন্তু শরীর মন কিছুতে সায় দিচ্চে না—তবু এবারকার সুযোগ ছাড়্‌তে সাহস হয় না—যদি কিছু কুড়িয়ে আন্‌তে পারি তা হ'লেই বাকি যে ক-টা দিন বাঁচি বিশ্রাম ক'র্‌তে পার্‌বো। নইলে দিনে দিনে মূলধন খুইয়ে দিয়ে অবশেষে বাতি নিবিয়ে দিয়ে বিদায় নেওয়া সেও মন্দ প্ল্যান নয়—সামান্য কিছু উচ্ছিষ্ট ছড়িয়ে রেখে গেলে জিনিষটা নোংরা হ'য়ে উঠ্‌বে। সম্বল যতই ক'মে আস্‌তে থাকে মানুষের আন্তরিক দুর্ব্বলতা ততই ধরা পড়ে—ততই শৈথিল্য ঝগড়াঝাঁটি পরস্পরের বিরুদ্ধে কানাকানি। ঔদার্য্য, ভরা-উদরের উপরে অনেকটা নির্ভর করে। কিন্তু যেখানেই যথার্থ সিদ্ধির

একটি চেহারা দেখ্‌তে পাই সেখানেই দেখা যায় সেটা কেবলমাত্র টাকা দিয়ে হাটে কেনবার নয়—দারিদ্র্যের জমিতেই সে সোনার ফসল ফলায়। এখানকার শিক্ষা-ব্যবস্থায় যে অক্লান্ত উদ্যম, সাহস, বুদ্ধিশক্তি, যে আত্মোৎসর্গ দেখলুম তা'র অতি অল্প পরিমাণ থাক্‌লেও কৃতার্থ হ'তুম। আন্তরিক শক্তি ও অকৃত্রিম উৎসাহ যত কম থাকে টাকা খুঁজ্‌তে হয় ততই বেশি ক'রে। ইতি ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩০।

মস্কৌ থাক্‌তে সোভিয়েট ব্যবস্থা সম্বন্ধে ছুটো বড়ো বড়ো চিঠি লিখেছিলুম। সে-চিঠি কবে পাবে এবং পাবে কিনা কী জানি।

বর্লিনে এসে একসঙ্গে তোমার ছু-খানা চিঠি পাওয়া গেল। ঘন বর্ষার চিঠি, শান্তিনিকেতনের আকাশে শালবনের উপরে মেঘের ছায়া এবং জলের ধারায় শ্রাবণ ঘনিয়ে উঠেচে সেই ছবি মনে জাগ্‌লে আমার চিত্ত কী রকম উৎসুক হ'য়ে ওঠে সে তোমাকে বলা বাহুল্য।

কিন্তু এবারে রাশিয়া ঘুরে এসে সেই সৌন্দর্য্যের ছবি আমার মন থেকে মুছে গেচে। কেবলি ভাবচি আমাদের দেশজোড়া চাষীদের দুঃখের কথা। আমার যৌবনের আরম্ভকাল থেকেই বাংলা-দেশের পল্লীগ্রামের সঙ্গে আমার নিকট-পরিচয় হ'য়েচে। তখন চাষীদের সঙ্গে আমার প্রত্যহ ছিল দেখা-শোনা— ওদের সব নালিশ উঠেচে আমার কানে। আমি জানি ওদের মতো নিঃসহায় জীব অল্পই আছে, ওরা সমাজের যে-তলায় তলিয়ে, সেখানে জ্ঞানের আলো অল্পই পৌঁছয়, প্রাণের হাওয়া বয় না ব'ল্‌লেই হয়।

তখনকার দিনে দেশের পলিটিক্‌স্ নিয়ে যাঁরা আসর জমিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে একজনও ছিলেন না যাঁরা পল্লীবাসীকে এদেশের লোক ব'লে অনুভব ক'র্‌তেন। আমার মনে আছে পাবনা কনফারেন্সের সময় আমি তখনকার খুব বড়ো একজন রাষ্ট্রনেতাকে ব'লেছিলুম, আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় উন্নতিকে যদি আমরা সত্য ক'র্‌তে চাই তাহ'লে সব আগে আমাদের এই তলার লোকদের মানুষ ক'র্‌তে হবে। তিনি সে-কথাটাকে এতই তুচ্ছ ব'লে উড়িয়ে দিলেন, যে, আমি স্পষ্ট বুঝ্‌তে পার্‌লুম যে আমাদের দেশাত্মবোধীরা দেশ ব'লে একটা

তত্ত্বকে বিদেশের পাঠশালা থেকে সংগ্রহ ক'রে এনেচেন, দেশের মানুষকে তাঁরা অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করেন না। এই রকম মনোবৃত্তির সুবিধে হ'চ্চে এই, যে, আমাদের দেশ আছে বিদেশীর হাতে এই কথা নিয়ে আক্ষেপ করা, উত্তেজিত হওয়া, কবিতা লেখা, খবরের কাগজ চালানো সহজ, কিন্তু দেশের লোক আমাদের আপন লোক, এ-কথা বলবামাত্র তা'র দায়িত্ব তখন থেকেই স্বীকার ক'রে নিতে হয়, কাজ সুরু হয় সেই মুহূর্ত্তে।

সেদিনকার পরেও অনেক দিন চ'লে গেল। সেই পাবনা কন্‌ফারেন্সে পল্লীসম্বন্ধে যা ব'লেছিলুম তা'র প্রতিধ্বনি অনেকবার শুনেচি—শুধু শব্দ নয় পল্লীর হিত কল্পে অর্থও সংগ্রহ হ'য়েচে—কিন্তু দেশের যে-উপরিতলায় শব্দের আবৃত্তি হয় সেইখানটাতেই সেই অর্থও আবর্ত্তিত হ'য়ে বিলুপ্ত হ'য়েচে, সমাজের যে-গভীরতলায় পল্লী তলিয়ে আছে সেখানে তা'র কিছুই পৌঁছলো না।

একদা আমি পদ্মার চরে বোট বেঁধে সাহিত্য-চর্চ্চা ক'রেছিলুম। মনে ধারণা ছিল, লেখনী দিয়ে ভাবের খনি খনন ক'র্‌বো এই আমার একমাত্র কাজ, আর কোনো কাজের আমি যোগ্যই নই। কিন্তু যখন এ-কথা কাউকে ব'লে-ক'য়ে বোঝাতে পার্‌লুম না, যে,

আমাদের স্বায়ত্বশাসনের ক্ষেত্র হ'চ্চে কৃষিপল্লীতে, তা'র চর্চ্চা আজ থেকেই সুরু করা চাই, তখন কিছুক্ষণের জন্যে কলম কানে গুঁজে এ-কথা আমাকে ব'ল্‌তে হ'লো —আচ্ছা,আমিই এ-কাজে লাগ্‌বো। এই সঙ্কল্পে আমার সহায়তা কর্‌বার জন্যে সেদিন একটি মাত্র লোক পেয়েছিলুম, সে হ'চ্চে কালীমোহন। শরীর তা'র রোগে জীর্ণ, দু-বেলা তা'র জ্বর আসে, তা'র উপরে পুলিশের খাতায় তা'র নাম উঠেচে।

তারপর থেকে দুর্গম বন্ধুর পথে সামান্য পাথেয় নিয়ে চ'লেচে সেই ইতিহাস। চাষীকে আত্মশক্তিতে দৃঢ় ক'রে তুল্‌তে হবে এই ছিল আমার অভিপ্রায়। এ সম্বন্ধে দুটো কথা সর্ব্বদাই আমার মনে আন্দোলিত হ'য়েচে—জমির স্বত্ব ন্যায়ত জমিদারের নয়, সে চাষীর; দ্বিতীয়ত সমবায় নীতি অনুসারে চাষের ক্ষেত্র একত্র ক'রে চাষ না ক'র্‌তে পার্‌লে কৃষির উন্নতি হ'তেই পারে না। মান্ধাতার আমলের হাল লাঙল নিয়ে আল-বাঁধা টুক্‌রো জমিতে ফসল ফলানো আর ফুটো কলসীতে জল আনা একই কথা।

কিন্তু এই দুটো পন্থাই দুরূহ। প্রথমত চাষীকে জমির স্বত্ব দিলেই সে-স্বত্ব পর-মুহূর্ত্তেই মহাজনের

হাতে গিয়ে প'ড়্‌বে, তা'র দুঃখভার বাড়্‌বে বই ক'ম্‌বে না। কৃষিক্ষেত্র একত্রীকরণের কথা আমি নিজে একদিন চাষীদের ডেকে আলোচনা ক'রেছিলুম। শিলাইদহে আমি যে-বাড়িতে থাক্‌তুম, তা'র বারান্দা থেকে দেখা যায় ক্ষেতের পর ক্ষেত নিরন্তর চ'লে গেচে দিগন্ত পেরিয়ে। ভোরবেলা থেকে হাল লাঙল এবং গোরু নিয়ে একটি একটি ক'রে চাষী আসে, আপন টুক্‌রো ক্ষেতটুকু ঘুরে ঘুরে চাষ ক'রে চ'লে যায়। এই রকম ভাগ-করা শক্তির যে কতটা অপচয় ঘটে প্রতিদিন সে আমি স্বচক্ষে দেখেচি। চাষীদের ডেকে যখন সমস্ত জমি একত্র ক'রে কলের লাঙলে চাষ করার সুবিধের কথা বুঝিয়ে ব'ল্‌লুম তা'রা তখনই সমস্ত মেনে নিলে। কিন্তু ব'ল্‌লে, আমরা নির্ব্বোধ, এত বড়ো ব্যাপার ক'রে তুল্‌তে পার্‌বো কী ক'রে! আমি যদি ব'ল্‌তে পার্‌তুম, এ ভার আমিই নেবো তাহ'লে তখনই মিটে যেতে পার্‌তো। কিন্তু আমার সাধ্য কী? এমন কাজের চালনা-ভার নেবার দায়িত্ব আমার পক্ষে অসম্ভব—সে শিক্ষা, সে শক্তি আমার নেই।

কিন্তু এই কথাটা বরাবর আমার মনে জেগেছিলো। যখন বোলপুরের কো-অপারেটিভের ব্যবস্থা বিশ্বভারতীর

হাতে এলো তখন আবার একদিন আশা হ'য়েছিলো এই-বার বুঝি সুযোগ হ'তে পার্‌বে। যাদের হাতে আপিসের ভার তাদের বয়স অল্প, আমার চেয়ে তাদের হিসাবী বুদ্ধি এবং শিক্ষা অনেক বেশি। কিন্তু আমাদের যুবকেরা ইস্কুলে-পড়া ছেলে, তাদের বই মুখস্থ করার মন। যে-শিক্ষা আমাদের দেশে প্রচলিত তাতে ক'রে আমাদের চিন্তা করার সাহস, কর্ম্ম কর্‌বার দক্ষতা থাকে না, পুঁথির বুলি পুনরাবৃত্তি করার 'পরেই ছাত্রদের পরিত্রাণ নির্ভর করে।

বুদ্ধির এই পল্লবগ্রাহিতা ছাড়া আমাদের আর একটা বিপদ ঘটে। ইস্কুলে যারা পড়া মুখস্থ ক'রেচে, আর ইস্কুলের বাইরে প'ড়ে থেকে যারা পড়া মুখস্থ করেনি, তাদের মধ্যে শ্রেণী-বিভাগ ঘ'টে গেচে,—শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত। ইস্কুলে-পড়া মনের আত্মীয়তা-বোধ পুঁথি-পোড়োদের পড়ার বাইরে পৌঁছতে পারে না। যাদের আমরা বলি চাষাভূষো, পুঁথির পাতার পর্দ্দা ভেদ ক'রে তাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি পৌঁছয় না, তা'রা আমাদের কাছে অস্পষ্ট। এই জন্যেই ওরা আমাদের সকল প্রচেষ্টা থেকে স্বভাবতই বাদ প'ড়ে যায়। তাই কো-অপারেটিভের যোগে অন্য

দেশে যখন সমাজের নীচের তলায় একটা সৃষ্টির কাজ চ'ল্‌চে, আমাদের দেশে টিপে টিপে টাকা ধার দেওয়ার বেশি কিছু এগোয় না। কেননা ধার দেওয়া, তা'র সুদ কষা, এবং দেনার টাকা আদায় করা অত্যন্ত ভীরু মনের পক্ষেও সহজ কাজ, এমন কি ভীরু মনের পক্ষেই সহজ, তাতে যদি নামতার ভুল না ঘটে তাহ'লে কোনো বিপদ নেই।

বুদ্ধির সাহস এবং জনসাধারণের প্রতি দরদ-বোধ এই উভয়ের অভাব ঘটাতেই দুঃখীর দুঃখ আমাদের দেশে ঘোচানো এত কঠিন হ'য়েচে; কিন্তু এই অভাবের জন্য কাউকে দোষ দেওয়া যায় না। কেননা কেরাণী-তৈরির কারখানা বসাবার জন্যেই একদা আমাদের দেশে বণিক-রাজত্বে ইস্কুলের পত্তন হ'য়েছিলো। ডেস্ক-লোকে মনিবের সঙ্গে সাযুজ্যলাভই আমাদের সদ্‌গতি। সেই জন্যে উমেদারীতে অকৃতার্থ হ'লেই আমাদের বিদ্যাশিক্ষা ব্যর্থ হ'য়ে যায়। এই জন্যেই আমাদের দেশে প্রধানত দেশের কাজ কংগ্রেসের পাণ্ডালে এবং খবরের কাগজের প্রবন্ধমালায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেদনা উদ্‌ঘোষণের মধ্যেই পাক খাচ্ছিলো। আমাদের কলমে বাঁধা হাত দেশকে গ'ড়ে তোল্‌বার কাজে এগোতেই পার্‌লে না।

ঐ দেশের হাওয়াতেই আমিও তো মানুষ, সেই জন্যেই জোরের সঙ্গে মনে ক'র্‌তে সাহস হয়নি, যে, বহু কোটি জনসাধারণের বুকের উপর থেকে অশিক্ষা ও অসামর্থ্যের জগদ্দল পাথর ঠেলে নামানো সম্ভব। অল্প-স্বল্প কিছু ক'র্‌তে পারা যায় কি-না এতদিন এই কথাই ভেবেচি। মনে ক'রেছিলুম সমাজের একটি চির-বাধা-গ্রস্ত তলা আছে সেখানে কোনো কালেই সূর্য্যের আলো সম্পূর্ণ প্রবেশ করানো চ'ল্‌বে না, সেই জন্যেই সেখানে অন্তত তেলের বাতি জ্বালাবার জন্যে উঠে প'ড়ে লাগা উচিত। কিন্তু সাধারণত সেটুকু কর্ত্তব্যবোধও লোকের মনে যথেষ্ট জোরের সঙ্গে ধাক্কা মার্‌তে চায় না, কারণ যাদের আমরা অন্ধকারে দেখ্‌তেই পাইনে, তাদের জন্যে যে কিছুই করা যেতে পারে এ-কথা স্পষ্ট ক'রে মনে আসে না।

এই রকম স্বল্পসাহস মন নিয়েই রাশিয়াতে এসে-ছিলুম, শুনেছিলুম এখানে চাষী ও কর্ম্মিকদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের পরিমাণ অনেক বেড়ে চ'লেচে। ভেবে-ছিলুম, তা'র মানে ওখানে পল্লীর পাঠশালায় শিশুশিক্ষার প্রথম ভাগ বড়ো-জোর দ্বিতীয় ভাগ পড়ানোর কাজ সংখ্যায় আমাদের চেয়ে বেশি হ'য়েচে। ভেবেছিলুম

ওদের সাংখ্যিক তালিকা নেড়েচেড়ে দেখ্‌তে পাবো ওদের ক-জন চাষী নাম সই ক'র্‌তে পারে আর ক-জন চাষীর নামতা দশের কোঠা পর্য্যন্ত এগিয়েচে।

মনে রেখো, এখানে যে-বিপ্লবে জারের শাসন লয় পেলে সেটা ঘ'টেচে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে। অর্থাৎ তেরো বছর পার হ'লো মাত্র। ইতিমধ্যে ঘরে বাইরে এদের প্রচণ্ড বিরুদ্ধতার সঙ্গে ল'ড়ে চ'ল্‌তে হ'য়েচে। এরা একা, অত্যন্ত ভাঙাচোরা একটা রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বোঝা নিয়ে। পথ পূর্ব্বতন দুঃশাসনের প্রভূত আবর্জ্জনায় দুর্গম। যে-আত্মবিপ্লবের প্রবল ঝড়ের মুখে এরা নবযুগের ঘাটে পাড়ি দিলে সেই বিপ্লবের প্রচ্ছন্ন এবং প্রকাশ্য সহায় ছিল ইংলণ্ড এবং আমেরিকা। অর্থসম্বল এদের সামান্য—বিদেশের মহাজনী গদিতে এদের ক্রেডিট নেই। দেশের মধ্যে কলকারখানা এদের যথেষ্ট পরিমাণে না থাকাতে অর্থ-উৎপাদনে এরা শক্তিহীন। এইজন্যে কোনো মতে পেটের ভাত বিক্রি ক'রে চ'ল্‌চে এদের উদ্যোগপর্ব্ব। অথচ রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় সকলের চেয়ে যে-অনুৎপাদক বিভাগ—সৈনিক বিভাগ—তাকে সম্পূর্ণরূপে সুদক্ষ রাখার অপব্যয় এদের পক্ষে অনিবার্য্য। কেননা আধুনিক মহাজনী যুগের সমস্ত

রাষ্ট্রশক্তি এদের শত্রুপক্ষ এবং তা'রা সকলেই আপন আপন অস্ত্রশালা কানায় কানায় ভ'রে তুলেচে।

মনে আছে এরাই লীগ্ অফ্ নেশন্‌সে অস্ত্রবর্জ্জনের প্রস্তাব পাঠিয়ে দিয়ে কপট শান্তিকামীদের মনে চমক লাগিয়ে দিয়েছিলো। কেননা নিজেদের প্রতাপ বর্দ্ধন বা রক্ষণ সোভিয়েট্‌দের লক্ষ্য নয়—এদের সাধনা হ'চ্চে জনসাধারণের শিক্ষা স্বাস্থ্য অন্নসম্বলের উপায় উপকরণকে প্রকৃষ্ট প্রণালীতে ব্যাপক ক'রে গ'ড়ে তোলা, এদেরই পক্ষে নিরুপদ্রব শান্তির দরকার সব চেয়ে বেশি। কিন্তু তুমি তো জানো, লীগ্ অফ্ নেশন্‌সের সমস্ত পালোয়ানই গুণ্ডাগিরির বহুবিস্তৃত উদ্যোগ কিছুতেই বন্ধ ক'র্‌তে চায় না কিন্তু শান্তি চাই ব'লে সকলে মিলে হাঁক পাড়ে। এই জন্যেই সকল সাম্রাজিক দেশেই অস্ত্রশস্ত্রের কাঁটাবনের চাষ অন্নের চাষকে ছাপিয়ে বেড়ে চ'লেচে। এর মধ্যে আবার কিছুকাল ধ'রে রাশিয়ায় অতি ভীষণ দুর্ভিক্ষ ঘ'টেছিলো—কত লোক ম'রেচে তা'র ঠিক নেই। তা'র ধাক্কা কাটিয়ে সবে মাত্র আট বছর এরা নূতন যুগকে গ'ড়ে তোল্‌বার কাজে লাগ্‌তে পেরেচে, বাইরের উপকরণের অভাব সত্ত্বেও।

কাজ. সামান্য নয়—য়ুরোপ এশিয়া জুড়ে প্রকাণ্ড

এদের রাষ্ট্রক্ষেত্র। প্রজামণ্ডলীর মধ্যে যত বিভিন্ন জাতের মানুষ আছে, ভারতবর্ষেও এত নেই। তাদের ভূপ্রকৃতি মানবপ্রকৃতির মধ্যে পরস্পর পার্থক্য অনেক বেশি। বস্তুত এদের সমস্যা বহুবিচিত্র জাতি-সমাকীর্ণ, বহুবিচিত্র অবস্থা-সঙ্কুল বিশ্বপৃথিবীর সমস্যারই সংক্ষিপ্ত রূপ।

তোমাকে পূর্ব্বেই ব'লেচি, বাহির থেকে মস্কৌ শহরে যখন চোখ প'ড়্‌লো দেখ্‌লুম য়ুরোপের অন্য সমস্ত ধনী শহরের তুলনায় অত্যন্ত মলিন।✓ রাস্তায় যারা চ'লেচে তা'রা একজনও সৌখীন নয়, সমস্ত শহর আট-পৌরে কাপড়-পরা। আটপৌরে কাপড়ে শ্রেণীভেদ থাকে না, শ্রেণীভেদ পোষাকী কাপড়ে। এখানে সাজে পরিচ্ছদে সবাই এক। সবটা মিলেই শ্রমিকদের পাড়া—যেখানে দৃষ্টি পড়ে সেইখানেই ওরা। এখানে শ্রমিকদের কৃষাণদের কী-রকম বদল হ'য়েচে তা দেখ্‌বার জন্যে লাইব্রেরিতে গিয়ে বই খুল্‌তে অথবা গাঁয়ে কিম্বা বস্‌তিতে গিয়ে নোট নিতে হয় না। যাদের আমরা 'ভদ্দর লোক' ব'লে থাকি তা'রা কোথায় সেইটেই জিজ্ঞাস্য।

এখানকার জনসাধারণ ভদ্রলোকের আওতায়

একটুও ছায়া-ঢাকা প'ড়ে নেই, যারা যুগে যুগে নেপথ্যে ছিল তা'রা আজ সম্পূর্ণ প্রকাশ্যে। এরা যে প্রথম ভাগ শিশুশিক্ষা প'ড়ে কেবলমাত্র ছাপার অক্ষর হাৎড়ে বেড়াতে শিখেচে এ ভুল ভাঙতে একটুও দেরি হ'লো না। এরা মানুষ হ'য়ে উঠেচে এই ক-টা বছরেই।

নিজের দেশের চাষীদের মজুরদের মনে প'ড়্‌লো। মনে হ'লো আরব্য উপন্যাসের জাদুকরের কীর্ত্তি। বছর দশেক আগেই এরা আমাদেরই দেশের জন-মজুরদের মতোই নিরক্ষর নিঃসহায় নিরন্ন ছিল, তাদেরই মতো অন্ধসংস্কার এবং মূঢ় ধার্ম্মিকতা। দুঃখে বিপদে এরা দেবতার দ্বারে মাথা খুঁড়েচে, পরলোকের ভয়ে পাণ্ডাপুরুৎদের হাতে এদের বুদ্ধি ছিল বাঁধা আর ইহলোকের ভয়ে রাজপুরুষ মহাজন ও জমিদারদের হাতে; যারা এদের জুতো পেটা ক'র্‌তো তাদের সেই জুতো সাফ করা এদের কাজ ছিল। হাজার বছর থেকে এদের প্রথাপদ্ধতির বদল হয়নি, যান বাহন চরকা ঘানি সমস্ত প্রপিতামহের আমলের, হালের হাতিয়ারে হাত লাগাতে ব'ল্‌লে বেঁকে ব'স্‌তো। আমাদের দেশের ত্রিশকোটির পিঠের উপরে যেমন চেপে ব'সেচে ভূত কালের ভূত, চেপে ধ'রেচে তাদের

দুই চোখ—এদেরও ঠিক তেমনিই ছিল। ক-টা বছরের মধ্যে এই মূঢ়তার অক্ষমতার পাহাড় নড়িয়ে দিলে যে কী ক'রে সে-কথা এই হতভাগ্য ভারতবাসীকে যেমন একান্ত বিস্মিত ক'রেচে এমন আর কা'কে ক'র্‌বে বলো? অথচ যে-সময়ের মধ্যে এই পরিবর্ত্তন চ'ল্‌ছিলো সে-সময়ে এ-দেশে আমাদের দেশের বহু-প্রশংসিত law and order ছিল না।

তোমাকে পূর্ব্বেই ব'লেচি এদের জনসাধারণের শিক্ষার চেহারা দেখ্‌বার জন্যে আমাকে দূরে যেতে হয়নি কিম্বা স্কুলের ইনস্পেক্টরের মতো এদের বানান তদন্ত কর্‌বার সময় দেখ্‌তে হয়নি "কান"-এ "সোনা'য় এরা মূর্দ্ধণ্য ণ লাগায় কি না। একদিন সন্ধ্যাবেলা মস্কৌ শহরে একটা বাড়িতে গিয়েছিলুম, সেটা চাষীদের বাসা, গ্রাম থেকে কোনো উপলক্ষ্যে যখন তা'রা শহরে আসে তখন সস্তায় ঐ বাড়িতে কিছুদিনের মতো থাক্‌তে পায়। তাদের সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা হ'য়েছিলো। সে-রকম কথাবার্ত্তা যখন আমাদের দেশের চাষীদের সঙ্গে হবে সেইদিন সাইমন্ কমিশনের জবাব দিতে পার্‌বো।

আর কিছু নয়, এটা স্পষ্ট দেখ্‌তে পেয়েচি সবই

হ'তে পার্‌তো কিন্তু হয়নি—না হোক্ আমরা পেয়েচি law and order। আমাদের ওখানে সাম্প্রদায়িক লড়াই ঘটে ব'লে একটা অখ্যাতি বিশেষ ঝোঁক দিয়ে রটনা হ'য়ে থাকে—এখানেও য়িহুদি সম্প্রদায়ের সঙ্গে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের লড়াই আমাদের দেশেরই আধুনিক উপসর্গের মতো অতি কুৎসিত অতি বর্ব্বর ভাবেই ঘ'ট্‌তো—শিক্ষায় এবং শাসনে একেবারে তা'র মূল উৎপাটিত হ'য়েচে। কতবার আমি ভেবেচি আমাদের দেশে সাইমন কমিশন যাবার আগে একবার রাশিয়ায় তা'র ঘুরে যাওয়া উচিত ছিল।

তোমার মতো ভদ্রমহিলাকে সাধারণ ভদ্রগোছের চিঠি না লিখে এ-রকম চিঠি যে কেন লিখ্‌লুম তা'র কারণ চিন্তা ক'র্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে দেশের দশা আমার মনের মধ্যে কী-রকম তোল্‌পাড় ক'র্‌চে, জালিয়ান-ওয়ালাবাগের উপদ্রবের পর একবার আমার মনে এই রকম অশান্তি জেগেছিলো। এবার ঢাকার উপদ্রবের পর আবার সেই রকম দুঃখ পাচ্চি। সে-ঘটনার উপর সরকারী চূণকামের কাজ হ'য়েচে কিন্তু এ-রকম সরকারী চূণকামের যে কী মূল্য তা রাষ্ট্রনীতিবিৎ সবাই জানে। এই রকম ঘটনা যদি সোভিয়েট রাশিয়ায় ঘ'ট্‌তো

তাহ'লে কোনো চূণকামেই তা'র কলঙ্ক ঢাকা প'ড়্‌তো না। সুধীন্দ্র, আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে যার কোনো শ্রদ্ধা কোনো দিন ছিল না, সেও এবারে আমাকে এমন চিঠি লিখেচে যাতে বোঝা যাচ্চে সরকারী ধর্ম্মনীতির প্রতি ধিক্কার আজ আমাদের দেশে কতদূর পর্য্যন্ত পৌঁছেচে। যা হোক্ তোমার চিঠি অসমাপ্ত রইলো—কাগজ এবং সময় ফুরিয়ে এসেচে, পরের চিঠিতে এ চিঠির অসম্পূর্ণ অংশ সম্পূর্ণ ক'র্‌বো। ইতি সেপ্টেম্বর ২৮, ১৯৩০।

বর্লিন

মস্কৌ থেকে তোমাকে একটা বড়ো চিঠিতে রাশিয়া সম্বন্ধে আমার ধারণা লিখেছিলুম। সে-চিঠি যদি পাও তো রাশিয়া সম্বন্ধে কিছু খবর পাবে।

এখানে চাষীদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য কতটা কাজ করা হ'চ্চে তা'রই বিবরণ কিছু দিয়েচি। আমাদের দেশে যে-শ্রেণীর লোক মূক, মূঢ়, জীবনের

সকল সুযোগ থেকে বঞ্চিত হ'য়ে যাদের মন অন্তর বাহিরের দৈন্যের তলায় চাপা প'ড়ে গেচে এখানে সেই শ্রেণীর লোকের সঙ্গে যখন আমার পরিচয় হ'লো তখন বুঝ্‌তে পার্‌লুম সমাজের অনাদরে মানুষের চিত্ত-সম্পদ কত প্রভূত পরিমাণে অবলুপ্ত হ'য়ে থাকে—কী অসীম তা'র অপব্যয়, কী নিষ্ঠুর তা'র অবিচার।

মস্কৌতে একটি কৃষিভবন দেখ্‌তে গিয়েছিলুম। এটা ওদের ক্লাবের মতো। রাশিয়ার সমস্ত ছোটো বড়ো শহরে এবং গ্রামে এ-রকম আবাস ছড়ানো আছে। এ-সব জায়গায় কৃষিবিদ্যা সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে উপদেশ দেবার ব্যবস্থা আছে; যারা নিরক্ষর তাদের পড়াশুনো শেখানোর উপায় ক'রেচে, এখানে বিশেষ বিশেষ ক্লাসে বৈজ্ঞানিক রীতিতে চাষ করার ব্যবস্থা কৃষাণদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এই রকম প্রত্যেক বাড়িতে প্রাকৃতিক সামাজিক সকল প্রকার শিক্ষণীয় বিষয়ের ম্যুজিয়ম, তা ছাড়া চাষীদের সকল প্রকার প্রয়োজনের উপযোগী পরামর্শ দেবার সুযোগ ক'রে দেওয়া হ'য়েচে।

চাষীরা কোনো উপলক্ষ্যে গ্রাম থেকে যখন শহরে

আসে তখন খুব কম খরচে অন্তত তিন সপ্তাহ এই রকম বাড়িতে থাকৃতে পারে। এই বহুব্যাপক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট এককালের নিরক্ষর চাষীদের চিত্তকে উদ্বোধিত ক'রে সমাজব্যাপী নবজীবন প্রতিষ্ঠার প্রশস্ততম ভিত্তি স্থাপন ক'রেচে।

বাড়িতে ঢুকে দেখি খাবার ঘরে কেউ কেউ ব'সে খাচ্চে, পড়বার ঘরে একদল খবরের কাগজ প'ড়্তে প্রবৃত্ত। উপরে একটা বড়ো ঘরে আমি এসে ব'স্লুম —সেখানে সবাই এসে জমা হ'লো। তা'রা নানাস্থানের লোক, কেউ-বা অনেক দূব প্রদেশ থেকে এসেচে। বেশ সহজ ওদের ভাবগতিক; কোনো রকম সঙ্কোচ নেই।

প্রথম অভ্যর্থনা ও পরিচয় উপলক্ষ্যে বাড়ির পরিদর্শক কিছু ব'ল্লে, আমিও কিছু ব'ল্লুম। তারপরে ওরা আমাকে প্রশ্ন ক'র্তে আরম্ভ ক'র্লে।

প্রথমেই ওদের মধ্যে একজন আমাকে জিজ্ঞাসা ক'র্লে, ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঝগড়া হয় কেন?

উত্তর দিলুম, "যখন আমার বয়স অল্প ছিল কখনো এ-রকম বর্ব্বরতা দেখিনি। তখন গ্রামে এবং

শহরে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্দ্যের অভাব ছিল না। পরস্পরের ক্রিয়াকাণ্ডে পরস্পরের যোগ ছিল, জীবনযাত্রায় সুখে দুঃখে তা'রা ছিল এক। এ-সব কুৎসিত কাণ্ড দেখ্‌তে পাচ্চি যখন থেকে আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন সুরু হ'য়েচে। কিন্তু প্রতিবেশী-দের মধ্যে এই রকম অমানুষিক দুর্ব্ব্যবহারের আশু কারণ যাই হোক্, এর মূল কারণ হ'চ্চে আমাদের জনসাধারণের মধ্যে অশিক্ষা। যে-পরিমাণ শিক্ষার দ্বারা এই রকম দুর্ব্বুদ্ধি দূর হয় আমাদের দেশে বিস্তৃত-ভাবে তা'র প্রচলন করা আজ পর্য্যন্ত হয়নি। যা তোমাদের দেশে দেখলুম তাতে আমি বিস্মিত হ'য়েচি।"

প্রশ্ন। তুমি তো লেখক, তোমাদের চাষীদের কথা কি কিছু লিখেচো? ভবিষ্যতে তাদের কী গতি হবে?

উত্তর। শুধু লেখা কেন তাদের জন্য আমি কাজ ফেঁদেচি। আমার একলার সাধ্যে যতটুকু সম্ভব তাই দিয়ে তাদের শিক্ষার কাজ চালাই, পল্লীর উন্নতিসাধনে তাদের সাহায্য করি। কিন্তু তোমাদের এখানে যে প্রকাণ্ড শিক্ষাব্যাপার যে আশ্চর্য্য অল্প সময়ের মধ্যে তৈরি হ'য়েচে তা'র তুলনায় আমার এ উদ্যোগ অতি যৎসামান্য।

প্রশ্ন। আমাদের দেশে কৃষিক্ষেত্রের একত্রীকরণের যে চেষ্টা চ'ল্‌চে সে সম্বন্ধে তোমার মত কী ?

উত্তর। মত দেবার মতো আমার অভিজ্ঞতা হয়নি, তোমাদেরই কাছ থেকে শুন্‌তে চাই। আমার জান্‌বার কথা এই যে, এতে তোমাদের ইচ্ছার উপর জবরদস্তি করা হ'চ্চে কি না ?

প্রশ্ন। ভারতবর্ষে সবাই কি এই ঐকত্রিকতা এবং সাধারণভাবে এখানকার অন্য সমস্ত উদ্যোগের কথা কিছু জানে না ?

উত্তর। জান্‌বার মতো শিক্ষা অতি অল্প লোকেরই আছে। তা ছাড়া তোমাদের খবর নানা কারণে চাপা প'ড়ে যায়। এবং যা-কিছু শোনা যায় তাও সব বিশ্বাসযোগ্য নয়।

প্রশ্ন। আমাদের দেশে এই যে চাষীদের জন্যে আবাস ব্যবস্থা হ'য়েচে, এর অস্তিত্বও কি তুমি আগে জান্‌তে না ?

উত্তর। তোমাদের কল্যাণের জন্য কী করা হ'চ্চে মস্কৌএ এসে তা প্রথম দেখলুম এবং জান্‌লুম। যাই হোক্, এবার আমার প্রশ্নের উত্তর তোমরা দাও। চাষী প্রজার পক্ষে এই ঐকত্রিকতার ফলাফল সম্বন্ধে তোমাদের মত কী, তোমাদের ইচ্ছা কী ?

একজন যুবক চাষী, য়ুক্রেন প্রদেশ থেকে এসেচে,

সে ব'ল্‌লে, "ছু বছর হ'লো একটি ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত হ'য়েচে আমি তাতে কাজ করি। এই ক্ষেত্রের মধ্যে ফল ফসলের বাগান আছে তা'র থেকে আমরা সব্‌জির জোগান দিই সব কারখানা ঘরে। সেখানে সেগুলো টিনের কৌটোয় মোড়াই হয়। এ-ছাড়া বড়ো বড়ো ক্ষেত আছে সেখানে সব গমের চাষ। আট ঘণ্টা ক'রে আমাদের খাটুনি, প্রত্যেক পঞ্চম দিনে আমাদের ছুটি। আমাদের প্রতিবেশী যে-সব চাষী নিজের ক্ষেত নিজে চষে, তাদের চেয়ে আমাদের এখানে অন্তত দুনো ফল উৎপন্ন হয়।

"প্রায় গোড়াতেই আমাদের এই ঐকত্রিক চাষে দেড় শো চাষীর ক্ষেত মিলিয়ে দেওয়া হ'য়েছিলো। ১৯২৯ সালে অর্দ্ধেক চাষী তাদের ক্ষেত ফিরিয়ে নিলে। তা'র কারণ সোভিয়েট কম্যুন্‌ দলের প্রধান মন্ত্রী স্‌ট্যালিনের উপদেশ আমাদের কর্ম্মচারীরা ঠিক মতো ব্যবহার করেনি। তাঁর মতে ঐকত্রিকতার মূল নীতি হ'চ্চে সমাজবদ্ধ স্বেচ্ছাকৃত যোগ। কিন্তু অনেক জায়গায় আমলারা এই কথাটা মনে না রাখাতেই গোড়ার দিকে অনেক চাষী ঐকত্রিক কৃষিসমন্বয় ছেড়ে দিয়েছিলো। তা'র পরে ক্রমে তাদের মধ্যেকার সিকির-

ভাগ লোক আবার ফিরে এসেচে। এখন আগেকার চেয়ে আরো আমরা বল পেয়েচি। আমাদের দলের লোকের জন্যে নতুন সব বাসা, একটা নতুন ভোজন-শালা, আর একটা ইস্কুল তৈরি আরম্ভ হ'য়েচে।"

তারপরে সাইবীরিয়ার একজন চাষী স্ত্রীলোক ব'ল্‌লে, "সমবেত ক্ষেতের কাজে আমি প্রায় দশ বছর আছি। একটা কথা মনে রেখো ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্রের (collective farm) সঙ্গে নারী উন্নতি প্রচেষ্টার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। আজ দশ বছরের মধ্যে এখানে চাষী মেয়েদের বদল হ'য়েচে যথেষ্ট। নিজের উপর তাদের অনেক বেশি ভরসা হ'য়েচে। যে-সব মেয়ে পিছিয়ে আছে, ঐকত্রিক চাষের যারা প্রধান বাধা, এরাই তাদের মন গ'ড়ে তুল্‌চে। আমরা মেয়ে ঐক-ত্রিকরা দল তৈরি ক'রেচি, তা'রা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ঘুরে বেড়ায়, মেয়েদের মধ্যে কাজ করে, চিত্তের এবং অর্থের উন্নতি সাধনে ঐকত্রিকতার সুযোগ কত তা ওদের বুঝিয়ে দেয়। ঐকত্রিক দলের চাষী মেয়েদের জীবনযাত্রা সহজ ক'রে দেবার জন্য প্রত্যেক ঐকত্রিক ক্ষেত্রে একটি ক'রে শিশুপালনাবাস, শিশুবিদ্যালয় আর সাধারণ পাকশালা স্থাপিত হ'য়েচে।"

সুখোজ প্রদেশে জাইগাণ্ট্ নামক একটি সুবিখ্যাত সরকারী কৃষিক্ষেত্র আছে। সেখানকার একজন চাষী রাশিয়ায় ঐকত্রিকতার কী রকম বিস্তার হ'চ্চে সেই সম্বন্ধে আমাকে ব'ল্লে, "আমাদের এই ক্ষেতে জমির পরিমাণ এক লক্ষ হেক্টার (hectares)। গত বছরে সেখানে তিন হাজার চাষী কাজ ক'র্তো। এ-বছরে সংখ্যা কিছু কমে গেচে, কিন্তু ফসলের ফলন আগেকার চেয়ে বাড়বার কথা। কেননা জমিতে বিজ্ঞানসম্মত সার দেবার এবং কলের লাঙল ব্যবহার করবার ব্যবস্থা হ'য়েচে। এই রকম লাঙল এখন আমাদের তিনশোর বেশি আছে। প্রতিদিন আমাদের আটঘণ্টা কাজ কর্বার মেয়াদ। যারা তা'র বেশি কাজ করে তা'রা উপ্রি পারিশ্রমিক পায়। শীতের সময় ক্ষেতের কাজের পরিমাণ কমে, তখন চাষীরা বাড়ি-তৈরি রাস্তা-মেরামত প্রভৃতি নানা কাজে শহরে চ'লে যায়। এই অনুপস্থিতির সময়েও তা'রা বেতনের এক-তৃতীয়াংশ পেয়ে থাকে আর তাদের পরিবারের লোক তাদের নির্দ্দিষ্ট ঘরে বাস ক'রতে পায়।"

আমি ব'ল্লেম, "ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্রে আপন স্বতন্ত্র সম্পত্তি মিলিয়ে দেওয়া সম্বন্ধে তোমাদের

আপত্তি কিম্বা সম্মতি যদি থাকে আমাকে স্পষ্ট ক'রে বলো।"

পরিদর্শক প্রস্তাব ক'র্‌লে হাত তুলে' মত জানানো হোক্। দেখা গেল যাদের সম্মতি নেই এমন লোকও অনেক আছে। অসম্মতির কারণ তাদের ব'ল্‌তে ব'ল্‌লুম—ভালো ক'রে ব'ল্‌তে পার্‌লে না। একজন ব'ল্‌লে, আমি ভালো বুঝ্‌তে পারিনে। বেশ বোঝা গেল অসম্মতির কারণ মানব চরিত্রের মধ্যে। নিজের সম্পত্তির প্রতি নিজের মমতা, ওটা তর্কের বিষয় নয়, ওটা আমাদের সংস্কারগত। নিজেকে আমরা প্রকাশ ক'র্‌তে চাই, সম্পত্তি সেই প্রকাশের একটা উপায়।

তা'র চেয়ে বড়ো উপায় যাদের হাতে আছে তা'রা মহৎ, তা'রা সম্পত্তিকে গ্রাহ্য করে না। সমস্ত খুইয়ে দিতে তাদের বাধা নেই। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে আপন সম্পত্তি আপন ব্যক্তিরূপের ভাষা—সেটা হারালে সে যেন বোবা হ'য়ে যায়। সম্পত্তি যদি কেবল আপন জীবিকার জন্যে হ'তো, আত্মপ্রকাশের জন্যে না হ'তো, তাহ'লে যুক্তির দ্বারা বোঝানো সহজ হ'তো যে ওটা ত্যাগের দ্বারাই জীবিকার উন্নতি হ'তে পারে। আত্মপ্রকাশের উচ্চতম উপায়, যেমন বুদ্ধি, যেমন

গুণপনা, কেউ কারো কাছ থেকে জোর ক'রে কেড়ে নিতে পারে না, সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া চলে, ফাঁকি দেওয়া চলে। সেই কারণে সম্পত্তি বিভাগ ও ভোগ নিয়ে সমাজে এত নিষ্ঠুরতা, এত ছলনা, এত অন্তহীন বিরোধ।

এর একটি মাঝামাঝি সমাধান ছাড়া উপায় আছে ব'লে মনে করিনে—অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাক্‌বে অথচ তা'র ভোগের একান্ত স্বাতন্ত্র্যকে সীমাবদ্ধ ক'রে দিতে হবে। সেই সীমার বাইরেকার উদ্বৃত্ত অংশ সর্ব্বসাধারণের জন্যে ছাপিয়ে যাওয়া চাই। তাহ'লেই সম্পত্তির মমত্ব লুব্ধতায় প্রতারণায় বা নিষ্ঠুরতায় গিয়ে পৌঁছয় না।

সোভিয়েটরা এই সমস্যাকে সমাধান ক'র্‌তে গিয়ে তাকে অস্বীকার ক'র্‌তে চেয়েচে। সে-জন্যে জবরদস্তির সীমা নেই। এ-কথা বলা চলে না, যে, মানুষের স্বাতন্ত্র্য থাক্‌বে না, কিন্তু বলা চলে যে স্বার্থপরতা থাক্‌বে না। অর্থাৎ নিজের জন্যে কিছু নিজত্ব না হ'লে নয়, কিন্তু বাকি সমস্তই পরের জন্যে হওয়া চাই। আত্ম এবং পর উভয়কেই স্বীকার ক'রে তবেই তা'র সমাধান সম্ভব। কোনো একটাকে বাদ দিতে গেলেই মানব-

চরিত্রের সত্যের সঙ্গে লড়াই বেধে যায়। পশ্চিম মহাদেশের মানুষ জোর জিনিষটাকে অত্যন্ত বেশি বিশ্বাস করে। যে-ক্ষেত্রে জোরের যথার্থ কাজ আছে সে-ক্ষেত্রে সে খুবই ভালো, কিন্তু অন্যত্র সে বিপদ ঘটায়। সত্যের জোরকে গায়ের জোরের দ্বারা যত প্রবলভাবেই আমরা মেলাতে চেষ্টা করি, একদা তত প্রবলভাবেই তাদের বিচ্ছেদ ঘটে।

মধ্য-এশিয়ার বাস্কির রিপাব্লিকের (Bashkir Republic) একজন চাষী ব'ল্‌লে, "আজও আমার নিজের স্বতন্ত্র ক্ষেত আছে, কিন্তু নিকটবর্ত্তী ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্রে আমি শীঘ্রই যোগ দেবো। কেননা দেখেচি স্বাতন্ত্রিক প্রণালীর চেয়ে ঐকত্রিক প্রণালীতে ঢের ভালো জাতের এবং অধিক পরিমাণে ফসল উৎপন্ন করানো যায়। যেহেতু প্রকৃষ্টভাবে চাষ ক'র্‌তে গেলেই যন্ত্র চাই,—ছোটো ক্ষেতের মালিকের পক্ষে যন্ত্র কেনা চলে না। তা ছাড়া, আমাদের টুক্‌রো জমিতে যন্ত্রের ব্যবহার অসম্ভব।"

আমি ব'ল্‌লুম, "কাল একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীর সঙ্গে আলাপ হ'লো। তিনি ব'ল্‌লেন, মেয়েদের এবং শিশুদের সর্ব্বপ্রকার সুযোগের জন্যে
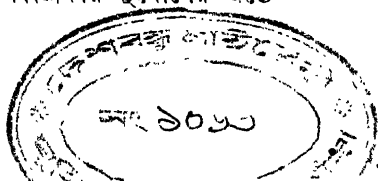
সোভিয়েট গবর্মেণ্টের দ্বারা যে-রকম সব ব্যবস্থা হ'য়েচে এ-রকম আর কোথাও হয় নি। আমি তাঁকে ব'ল্‌লুম, তোমরা পারিবারিক দায়িত্বকে সরকারী দায়িত্ব ক'রে তুলে' হয়তো পরিবারের সীমা লোপ ক'রে দিতে চাও। তিনি ব'ল্‌লেন, সেটাই-যে আমাদের আশু সঙ্কল্প তা নয় —কিন্তু শিশুদের প্রতি দায়িত্বকে ব্যাপক ক'রে দিয়ে যদি স্বভাবতই একদা পরিবারের গণ্ডী লোপ পায় তা হ'লে এই প্রমাণ হবে সমাজে পারিবারিক যুগ সঙ্কীর্ণতা এবং অসম্পূর্ণতা বশতই নবযুগের প্রসারতার মধ্যে আপনিই অন্তর্দ্ধান ক'রেচে। যা হোক্, এ সম্বন্ধে তোমাদের কী মত জান্‌তে ইচ্ছে করি। তোমরা কি মনে করো যে, তোমাদের একত্রীকরণেব নীতি বজায় রেখে পরিবার বজায় থাক্‌তে পারে ?"

সেই য়ুক্রেনিয়ার যুবকটি ব'ল্‌লে, "আমাদের নূতন সমাজ-ব্যবস্থা পারিবারিকতার উপর কী রকম প্রভাব বিস্তার ক'রেচে আমার নিজের দিক থেকে তা'র একটি দৃষ্টান্ত দিই। আমাব পিতা যখন বেঁচেছিলেন শীতের ছয় মাস তিনি শহরে কাজ ক'র্‌তেন আর গরমের ছয় মাস ভাই বোনদের নিয়ে আমি ধনীর চাকরি নিয়ে পশুচারণ ক'র্‌তে যেতুম। বাবার সঙ্গে আমাদের দেখা

প্রায়ই হ'তো না, এখন এ-রকম বিচ্ছেদ ঘটে না। শিশু-বিদ্যালয় থেকে আমার ছেলে রোজ ফিরে আসে, রোজই তা'র সঙ্গে দেখা হয়।"

একজন চাষী-মেয়ে ব'ল্‌লে, "শিশুদের দেখাশোনা ও শেখানোর স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হওয়াতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি ঢের কমে গেচে। তা ছাড়া, ছেলেদের সম্বন্ধে দায়িত্ব যে কতখানি তা বাপ মা ভালো ক'রে শিখতে পারচে।"

একটি ককেশীয় যুবতী দোভাষীকে ব'ল্‌লে, "কবিকে বলো, আমরা ককেশীয় রিপাব্লিকের লোকেরা বিশেষ ক'রেই অনুভব করি যে, অক্টোবরের বিপ্লবের পর থেকে আমরা যথার্থ স্বাধীনতা এবং সুখ পেয়েচি। আমরা নতুন যুগ সৃষ্টি ক'র্‌তে প্রবৃত্ত, তা'র কঠিন দায়িত্ব খুবই বুঝি, তা'র জন্যে চূড়ান্ত রকমের ত্যাগ-স্বীকার ক'র্‌তে আমরা রাজি। কবিকে জানাও, সোভিয়েট-সম্মিলনের বিচিত্র জাতির লোক তাঁর মারফৎ ভাবতবাসীদের 'পরে তাদের আন্তরিক দরদ জানাতে চায়। আমি ব'ল্‌তে পারি যদি সম্ভব হ'তো আমাব ঘরদুয়োর, আমার ছেলেপুলে সবাইকে ছেড়ে তাঁর স্বদেশীয়ের সাহায্য ক'র্‌তে যেতুম।"

দলের মধ্যে একজন ছিল তা'র মঙ্গোলীয় ছাঁদের মুখ। তা'র কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌তেই জবাব পেলুম, "সে খির্‌গিজ-জাতীয় চাষীর ছেলে, মস্কৌ এসেচে কলে কাপড়-বোনার বিদ্যা শিখ্‌তে। তিন বছর বাদে এঞ্জিনিয়র হ'য়ে তাদের রিপাব্লিকে ফিরে যাবে— বিপ্লবের পরে সেখানে একটি বড়ো কারখানা স্থাপিত হ'য়েচে সেইখানে সে কাজ ক'র্‌বে।"

একটা কথা মনে রেখো, এরা নানা জাতির লোক কলকারখানার রহস্য আয়ত্ত কর্‌বার জন্যে এত অবাধ উৎসাহ এবং সুযোগ পেয়েচে তা'র একমাত্র কারণ যন্ত্রকে ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় না। যত লোকেই শিক্ষা করুক তাতে সকল লোকেরই উপকার, কেবল ধনীলোকের নয়। আমরা আমাদের লোভের জন্যে যন্ত্রকে দোষ দিই, মাৎলামির জন্যে শাস্তি দিই তালগাছকে। মাষ্টার মশায় যেমন নিজের অক্ষমতার জন্য বেঞ্চির উপরে দাঁড় করিয়ে রাখেন ছাত্রকে।

সেদিন মস্কৌ কৃষি-আবাসে গিয়ে স্পষ্ট ক'রে স্বচক্ষে দেখ্‌তে পেলুম দশ বছরের মধ্যে রাশিয়ার চাষীরা ভারতবর্ষের চাষীদের কত বহুদূরে ছাড়িয়ে গেচে।

কেবল বই প'ড়্তে শেখেনি, ওদের মন গেচে ব'দ্‌লে, ওরা মানুষ হ'য়ে উঠেচে। শুধু শিক্ষার কথা ব'ল্‌লে সব কথা বলা হ'লো না, চাষের উন্নতির জন্যে সমস্ত দেশ জুড়ে যে প্রভূত উদ্যম সেও অসাধারণ। ভারতবর্ষেরই মতো এ-দেশ কৃষিপ্রধান দেশ, এইজন্যে কৃষিবিদ্যাকে যতদূর সম্ভব এগিয়ে দিতে না পার্‌লে দেশের মানুষকে বাঁচানো যায় না। এরা সে-কথা ভোলেনি। এরা অতি দুঃসাধ্য সাধন ক'র্‌তে প্রবৃত্ত।

সিভিল সার্ভিসের আমলাদের দিয়ে এরা মোটা মাইনের আপিস চালাবার কাজ ক'র্‌চে না, যারা যোগ্য লোক, যারা বৈজ্ঞানিক তা'রা সবাই লেগে গেচে। এই দশ বছরের মধ্যে এদের কৃষিচর্চ্চা বিভাগের যে-উন্নতি ঘটেচে, তা'র খ্যাতি ছড়িয়ে গেচে জগতের বৈজ্ঞানিক মহলে। যুদ্ধের পূর্ব্বে এ-দেশে বীজ বাছাইয়ের কোনো চেষ্টাই ছিল না। আজ প্রায় তিন কোটি মণ বাছাই-করা বীজ এদের হাতে জ'মেচে। তা ছাড়া নূতন শস্যের প্রচলন শুধু এদের কৃষি-কলেজের প্রাঙ্গণে নয়, দ্রুতবেগে সমস্ত দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হ'চ্চে। কৃষি সম্বন্ধে বড়ো বড়ো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাশালা আজরবাইজান, উজবেকিস্তান, জর্জ্জিয়া,

য়ুক্রেন প্রভৃতি রাশিয়ার প্রত্যন্ত প্রদেশেও স্থাপিত হ'য়েচে।

রাশিয়ার সমস্ত দেশ-প্রদেশকে জাতি-উপজাতিকে সক্ষম ও শিক্ষিত ক'রে তোলবার জন্যে এত বড়ো সর্ব্বব্যাপী অসামান্য অক্লান্ত উদ্যোগ আমাদের মতো ব্রিটিশ সাব্‌জেক্টের সুদূর কল্পনার অতীত। এতটা দূর পর্য্যন্ত ক'রে তোলা যে সম্ভব এখানে আসবার আগে কখনো আমি তা মনেও ক'র্‌তে পারিনি। কেননা শিশুকাল থেকে আমরা যে law and order-এর আবহাওয়ায় মানুষ, সেখানে এর কাছে পৌঁছতে পারে এমন দৃষ্টান্ত দেখিনি।

এবার ইংলণ্ডে থাক্‌তে একজন ইংরেজের কাছে প্রথম শুনেছিলুম সাধারণের কল্যাণের জন্যে এরা কী-রকম অসাধারণ আয়োজন ক'রেচে। চোখে দেখ্‌লুম —এও দেখ্‌তে পেলুম, এদের রাষ্ট্রে জাতিবর্ণবিচার একটুও নেই। সোভিয়েট শাসনের অন্তর্গত বর্ব্বরপ্রায় প্রজার মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য এরা যে প্রকৃষ্ট প্রণালীর ব্যবস্থা ক'রেচে ভারতবর্ষের জনসাধারণের পক্ষে তা দুর্লভ। অথচ এই অশিক্ষার অনিবার্য্য ফলে আমাদের বুদ্ধিতে চরিত্রে যে দুর্ব্বলতা, ব্যবহারে যে

মূঢ়তা, দেশবিদেশের কাছে তা'র রটনা চ'ল্‌চে। ইংরেজিতেই কথা চলিত আছে, যে-কুকুরকে ফাঁসি দিতে হবে তাকে বদ্‌নাম দিলে কাজ সহজ হয়। যাতে বদ্‌নামটা কোনোদিন না ঘোচে তা'র উপায় ক'র্‌লে যাবজ্জীবন মেয়াদ ও ফাঁসি দুই-ই মিলিয়ে নেওয়া চলে। ইতি ১লা অক্টোবর, ১৯৩০।

বর্লিন

রাশিয়া ঘুরে এসে আজ আমেরিকার মুখে চ'লেচি এমন সন্ধিক্ষণে তোমার চিঠি পেলুম। রাশিয়ায় গিয়েছিলুম ওদের শিক্ষাবিধি দেখ্‌বার জন্যে। দেখে খুবই বিস্মিত হ'য়েচি। আট বছরের মধ্যে শিক্ষার জোরে সমস্ত দেশের লোকের মনের চেহারা বদ্‌লে দিয়েচে। যারা মূক ছিল তা'রা ভাষা পেয়েচে, যারা মূঢ় ছিল তাদের চিত্তের আবরণ উদ্ঘাটিত, যারা অক্ষম ছিল তাদের আত্মশক্তি জাগরূক, যারা অব-মাননার তলায় তলিয়ে ছিল, আজ তা'রা সমাজের

অন্ধকুটুরী থেকে বেরিয়ে এসে সবার সঙ্গে সমান আসন পাবার অধিকারী। এত প্রভূত লোকের যে এত দ্রুত এমন ভাবান্তর ঘ'ট্‌তে পারে তা কল্পনা করা কঠিন। এদের এত কালের মরা-গাঙে শিক্ষার প্লাবন ব'য়েচে দেখে মন পুলকিত হয়। দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত সচেষ্ট সচেতন। এদের সামনে একটা নূতন আশার বীথিকা দিগন্ত পেরিয়ে অবারিত—সর্ব্বত্র জীবনের বেগ পূর্ণমাত্রায়।

এরা তিনটে জিনিষ নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত আছে। শিক্ষা, কৃষি এবং যন্ত্র। এই তিন পথ দিয়ে এরা সমস্ত জাতি মিলে চিত্ত, অন্ন এবং কর্ম্মশক্তিকে সম্পূর্ণতা দেবার সাধনা ক'র্‌চে। আমাদের দেশের মতোই এখানকার মানুষ কৃষিজীবী। কিন্তু আমাদের দেশের কৃষি একদিকে মূঢ় আর একদিকে অক্ষম, শিক্ষা এবং শক্তি দুই থেকেই বঞ্চিত। তা'র একমাত্র ক্ষীণ আশ্রয় হ'চ্চে প্রথা—পিতামহের আমলের চাকরের মতো, সে কাজ করে কম অথচ কর্ত্তৃত্ব করে বেশি। তাকে মেনে চ'ল্‌তে হ'লে তাকে এগিয়ে চল্‌বার উপায় থাকে না। অথচ শত শত বৎসর থেকে সে খুঁড়িয়ে চ'ল্‌চে।

আমাদের দেশে কোনো এক সময়ে গোবর্দ্ধনধারী

কৃষ্ণ বোধ হয় ছিলেন কৃষির দেবতা, গোয়ালার ঘরে তাঁর বিহার ; তাঁর দাদা বলরাম, হলধর। ঐ লাঙল অস্ত্রটা হ'লো মানুষের যন্ত্রবলের প্রতীক। কৃষিকে বল দান ক'রেচে যন্ত্র। আজকের দিনে আমাদের কৃষিক্ষেত্রের কোনো কিনারায় বলরামের দেখা নেই—তিনি লজ্জিত—যে-দেশে তাঁর অস্ত্রে তেজ আছে সেই সাগরপারে তিনি চ'লে গেচেন। রাশিয়ায় কৃষি বলরামকে ডাক দিয়েচে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেখানকার কেদারখণ্ডগুলো অখণ্ড হ'য়ে উঠ্‌লো, তাঁর নূতন হলের স্পর্শে অহল্যা ভূমিতে প্রাণসঞ্চার হ'য়েচে।

একটা কথা আমাদের মনে রাখা উচিত, রামেরই হলযন্ত্রধারী রূপ হ'চ্চে বলরাম।

১৯১৭খৃষ্টাব্দে এখানে যে বিপ্লব হ'য়ে গেল তা'র আগে এ-দেশে শতকরা নিরানব্বই জন চাষী আধুনিক হলযন্ত্র চক্ষেও দেখেনি। তা'রা সেদিন আমাদেরই চাষীদের মতো সম্পূর্ণ দুর্ব্বল রাম ছিল, নিরন্ন, নিঃসহায়, নির্ব্বাক। আজ দেখ্‌তে দেখ্‌তে এদের ক্ষেতে হাজার হাজার হলযন্ত্র নেমেচে। আগে এরা ছিল যাকে আমাদের ভাষায় বলে কৃষ্ণের জীব—আজ এরা হ'য়েচে বলরামের দল।

কিন্তু শুধু যন্ত্রে কোনো কাজ হয় না যন্ত্রী যদি মানুষ

না হ'য়ে ওঠে। এদের ক্ষেতের কৃষি মনের কৃষির সঙ্গে সঙ্গে এগোচ্চে। এখানকার শিক্ষার কাজ সজীব প্রণালীতে। আমি বরাবর ব'লে এসেচি শিক্ষাকে জীব-যাত্রার সঙ্গে মিলিয়ে চালানো উচিত। তা'র থেকে অবচ্ছিন্ন ক'রে নিলে ওটা ভাণ্ডারের সামগ্রী হয়, পাকযন্ত্রের খাদ্য হয় না।

এখানে এসে দেখ্‌লুম এরা শিক্ষাটাকে প্রাণবান্ ক'রে তুলেচে। তা'র কারণ এরা সংসারের সীমা থেকে ইস্কুলের সীমাকে সরিয়ে রাখেনি। এরা পাস কর্‌বার কিম্বা পণ্ডিত কর্‌বার জন্যে শেখায় না—সর্ব্বতোভাবে মানুষ কর্‌বার জন্যে শেখায়। আমাদের দেশে বিদ্যালয় আছে, কিন্তু বিদ্যার চেয়ে বুদ্ধি বড়ো, সংবাদের চেয়ে শক্তি বড়ো, পুঁথির পংক্তির বোঝার ভারে চিত্তকে চালনা কর্‌বার ক্ষমতা আমাদের থাকে না। কতবার চেষ্টা ক'রেচি আমাদের ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা ক'র্‌তে, কিন্তু দেখ্‌তে পাই তাদের মনে কোনো প্রশ্নও নেই। জান্‌তে চাওয়ার সঙ্গে জান্‌তে পাওয়ার যে যোগ আছে সে যোগ ও'দের বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেচে। ওরা কোনো দিন জান্‌তে চাইতে শেখেনি,—প্রথম থেকেই কেবলি বাঁধা নিয়মে ও'দের জানিয়ে দেওয়া হয়,

তারপরে সেই শিক্ষিত বিদ্যার পুনরাবৃত্তি ক'রে ওরা পরীক্ষার মার্কা সংগ্রহ করে।

আমার মনে আছে শান্তিনিকেতনে যখন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে মহাত্মাজীর ছাত্রেরা ছিল তখন একদিন তাদের মধ্যে একজনকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলুম আমাদের ছেলেদের সঙ্গে পারুল-বনে বেড়াতে যেতে ইচ্ছা করো কি? সে ব'ল্‌লে, জানিনে। এ-সম্বন্ধে সে তাদের দলপতিকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে চাইলে। আমি ব'ল্‌লুম জিজ্ঞাসা পরে ক'রো, কিন্তু বেড়াতে যেতে তোমার ইচ্ছা আছে কি না আমাকে বলো। সে ব'ল্‌লে, আমি জানিনে। অর্থাৎ এ ছাত্র স্বয়ং কোনো বিষয়ে কিছু ইচ্ছা কর্‌বার চর্চ্চাই করে না—তাকে চালনা করা হয় সে চলে, আপন থেকে তাকে কিছু ভাবতে হয় না।

এ-রকম সামান্য বিষয়ে মনের এতটা অসাড়তা যদিও সাধারণত আমাদের ছাত্রদের মধ্যে দেখা যায় না, কিন্তু এর চেয়ে আরও একটুখানি শক্ত রকমের চিন্তনীয় বিষয় যদি পাড়া যায় তবে দেখা যাবে সে-জন্যে এদের মন একটুখানিও প্রস্তুত নেই। এরা কেবলই অপেক্ষা ক'রে থাকে আমরা উপরে থেকে কী ব'ল্‌তে

পারি তাই শোন্‌বার জন্যে। সংসারে এ-রকম মনের মতো নিরুপায় মন আর হ’তে পারে না।

এখানে শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে নানারকম পরীক্ষা চ’ল্‌চে,তা’র বিস্তারিত বিবরণ পরে দেবার চেষ্টা ক’র্‌বো। শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে রিপোর্ট এবং বই প’ড়ে অনেকটা জানা যেতে পারে কিন্তু শিক্ষার চেহারা মানুষের মধ্যে যেটা প্রত্যক্ষ দেখা যায় সেটাই সব চেয়ে কাজের। সেইটে সেদিন দেখে এসেচি। পায়োনিয়র্স্ কম্যুন্ ব’লে এ-দেশে যে-সব আশ্রম স্থাপিত হ’য়েচে তা’রই একটা দেখ্‌তে সেদিন গিয়েছিলুম। আমাদের শান্তিনিকেতনে যে-রকম ব্রতীবালক ব্রতীবালিকা আছে এদের পায়োনিয়র্স্ দল কতকটা সেই ধরণের।

বাড়িতে প্রবেশ ক’রেই দেখি আমাকে অভ্যর্থনা কর্‌বার জন্যে সিঁড়ির দু-ধারে বালকবালিকার দল সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরে আস্‌তেই ওরা আমার চারদিকে ঘেঁষাঘেঁষি ক’রে ব’স্‌লো, যেন আমি ওদেরই আপন দলের। একটা কথা মনে রেখো এরা সকলেই পিতৃমাতৃহীন। এরা যে-শ্রেণী থেকে এসেচে একদা সে-শ্রেণীর মানুষ কারও কাছে কোনো যত্নের দাবী ক’র্‌তে পার্‌তো না, লক্ষ্মীছাড়া হ’য়ে নিতান্ত নীচ বৃত্তির

রবীন্দ্রনাথের চিত্র-প্রদর্শনীতে রবীন্দ্রনাথ

দ্বারা দিনপাত ক'র্‌তো। এদের মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌লুম, অনাদরের অসম্মানের কুয়াশা-ঢাকা চেহারা একেবারেই নয়। সঙ্কোচ নেই, জড়তা নেই। তা ছাড়া সকলেরই মনের মধ্যে একটা পণ, সামনে একটা কর্ম্মক্ষেত্র আছে ব'লে মনে হয় যেন সর্ব্বদা তৎপর হ'য়ে আছে, কোনো-কিছুতে অনবধানের শৈথিল্য থাক্‌বার জো নেই।

অভ্যর্থনার জবাবে আমি ওদের অল্প যা ব'লে-ছিলুম তা'রই প্রসঙ্গক্রমে একজন ছেলে ব'ল্‌লে, "পরশ্রম-জীবীরা (Bourgeoisie) নিজের ব্যক্তিগত মুনফা খোঁজে, আমরা চাই দেশের ঐশ্বর্য্যে সকল মানুষের সমান স্বত্ব থাকে। এই বিদ্যালয়ে আমরা সেই নীতি অনুসারে চ'লে থাকি।"

একটি মেয়ে ব'ল্‌লে, "আমরা নিজেরা নিজেদের চালনা করি। আমরা সকলে মিলে পরামর্শ ক'রে কাজ ক'রে থাকি, যেটা সকলের পক্ষেই শ্রেয় সেইটেই আমাদের স্বীকার্য্য।"

আর একটি ছেলে ব'ল্‌লে, "আমরা ভুল ক'র্‌তে পারি, কিন্তু যদি ইচ্ছা করি যারা আমাদের চেয়ে বড়ো তাদের পরামর্শ নিয়ে থাকি। প্রয়োজন হ'লে ছোটো

ছেলে-মেয়েরা বড়ো ছেলেমেয়েদের মত নেয় এবং তা'রা যেতে পারে তাদের শিক্ষকদের কাছে। আমাদের দেশের শাসনতন্ত্রের এই বিধি। আমরা এখানে সেই বিধিরই চর্চ্চা ক'রে থাকি।"

এর থেকে বুঝতে পার্‌বে এদের শিক্ষা কেবল পুঁথিপড়ার শিক্ষা নয়। নিজের ব্যবহারকে, চরিত্রকে একটা বৃহৎ লোকযাত্রার অনুগত ক'রে এরা তৈরি ক'রে তুল্‌চে। সেই সম্বন্ধে এদের একটা পণ আছে এবং সেই পণরক্ষায় এদের গৌরববোধ।

আমার ছেলেমেয়ে এবং শিক্ষকদের আমি অনেকবার ব'লেচি, লোকহিত এবং স্বায়ত্তশাসনের যে-দায়িত্ব বোধ আমরা সমস্ত দেশের কাছ থেকে দাবী ক'রে থাকি শান্তিনিকেতনের ছোটো সীমার মধ্যে তা'রই একটা সম্পূর্ণ রূপ দিতে চাই। এখানকার ব্যবস্থা ছাত্র ও শিক্ষকদের সমবেত স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা হওয়া দরকার,—সেই ব্যবস্থায় যখন এখানকার সমস্ত কর্ম্ম সুসম্পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌বে তখন এইটুকুর মধ্যে আমাদের সমস্ত দেশের সমস্যার পূরণ হ'তে পার্‌বে। ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে সাধারণ হিতের অনুগত ক'রে তোল্‌বার চর্চ্চা রাষ্ট্রীয় বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে হ'তে পারে

না, তা'র জন্যে ক্ষেত্র তৈরি ক'র্‌তে হয়—সেই ক্ষেত্র আমাদের আশ্রম।

একটা ছোটো দৃষ্টান্ত তোমাকে দিই। আহারের রুচি এবং অভ্যাস সম্বন্ধে বাংলা দেশে যেমন কদাচার এমন আর কোথাও নেই। পাকশালা এবং পাকযন্ত্রকে অত্যন্ত অনাবশ্যক আমরা ভারগ্রস্ত ক'রে তুলেচি। এ সম্বন্ধে সংস্কার করা বড়ো কঠিন। স্বজাতির চিরন্তন হিতের প্রতি লক্ষ্য ক'রে আমাদের ছাত্ররা ও শিক্ষকেরা পথ্য সম্বন্ধে নিজের রুচিকে যথোচিতভাবে নিয়ন্ত্রিত কর্‌বার পণ গ্রহণ ক'র্‌তে যদি পার্‌তো তাহ'লে আমি যাকে শিক্ষা বলি সেই শিক্ষা সার্থক হ'তো। তিন-নয়ে সাতাশ হয় এইটে মুখস্থ করাকে আমরা শিক্ষা ব'লে গণ্য ক'রে থাকি, সে-সম্বন্ধে ছেলেরা কোনো মতেই ভুল না করে তা'র প্রতি লক্ষ্য না করাকে গুরুতর অপরাধ ব'লে জানি, কিন্তু যে-জিনিষটাকে উদরস্থ করি সে-সম্বন্ধে শিক্ষাকে তা'র চেয়ে কম দাম দেওয়াই মূর্খতা। আমাদের প্রতিদিনের খাওয়া সম্বন্ধে আমাদের সমস্ত দেশের কাছে দায়িত্ব আছে এবং সে দায়িত্ব অতি গুরুতর—সম্পূর্ণ উপলব্ধির সঙ্গে এটাকে মনে রাখা পাসের মার্কার চেয়ে অনেক বড়ো।

আমি এদের জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম, "কেউ কোনো অপরাধ ক'র্‌লে এখানে তা'র বিধান কী ?"

একটি মেয়ে ব'ল্‌লে, "আমাদের কোনো শাসন নেই, কেননা আমরা নিজেদের শাস্তি দিই।"

আমি ব'ল্‌লুম, "আর একটু বিস্তারিত ক'রে বলো। কেউ অপরাধ ক'র্‌লে তা'র বিচার কর্‌বার জন্যে তোমরা কি বিশেষ সভা ডাকো ? নিজেদের মধ্যে থেকে কাউকে কি তোমরা বিচারক নির্ব্বাচন করো ? শাস্তি দেবার বিধিই বা কী রকমের ?"

একটি মেয়ে ব'ল্‌লে, "বিচারসভা যাকে বলে তা নয়, আমরা বলা-কওয়া করি। কাউকে অপরাধী করাই শাস্তি, তা'র চেয়ে শাস্তি আর নেই।"

একটি ছেলে ব'ল্‌লে, "সেও দুঃখিত হয় আমরাও দুঃখিত হই, বাস্ চুকে যায়।"

আমি ব'ল্‌লুম, "মনে করো কোনো ছেলে যদি ভাবে তা'র প্রতি অযথা দোষারোপ হ'চ্চে তাহ'লে তোমাদের উপরেও আর কারও কাছে কি সে ছেলের আপিল চলে ?"

ছেলেটি ব'ল্‌লে, "তখন আমরা ভোট নিই— অধিকাংশের মতে যদি স্থির হয় যে সে

অপরাধ ক'রেচে তাহ'লে তা'র উপরে আর কথা চলে না।"

আমি ব'ল্লুম, "কথা না চ'ল্তে পারে, কিন্তু তবু ছেলেটি যদি মনে করে অধিকাংশই তা'র উপরে অন্যায় ক'র্চে তাহ'লে তা'র কোনো প্রতিবিধান আছে কি?"

একটি মেয়ে উঠে ব'ল্লে, "তাহ'লে হয়তো আমরা শিক্ষকদের পরামর্শ নিতে যাই- -কিন্তু এ-রকম ঘটনা কখনও ঘটেনি।"

আমি ব'ল্লুম, "যে-একটি সাধনার মধ্যে সকলে আছ সেইটেতেই আপনা হ'তেই অপরাধ থেকে তোমাদের রক্ষা করে।"

ওদের কর্ত্তব্য কী প্রশ্ন করাতে ব'ল্লে, "অন্য দেশের লোকেরা নিজের কাজের জন্য অর্থ চায় সম্মান চায়, আমরা তা'র কিছুই চাই নে, আমরা সাধারণের হিত চাই। আমরা গাঁয়ের লোকদের শিক্ষা দেবার জন্যে পাড়াগাঁয়ে যাই, কী ক'রে পরিষ্কার হ'য়ে থাক্তে হয়, সকল কাজ কী ক'রে বুদ্ধিপূর্ব্বক ক'র্তে হয় এই সব তাদের বুঝিয়ে দিই। অনেক সময়ে আমরা তাদের মধ্যে গিয়েই বাস করি। নাটক অভিনয় করি, দেশের অবস্থার কথা বলি।"

তা'র পরে আমাকে দেখাতে চাইলে কাকে ওরা বলে সজীব সংবাদপত্র। একটি মেয়ে ব'ল্‌লে, "দেশের সম্বন্ধে আমাদের অনেক খবর জান্‌তে হয়, আমরা যা জানি তাই আবার অন্য সবাইকে জানানো আমাদের কর্ত্তব্য। কেননা ঠিকমতো ক'রে তথ্যগুলিকে জান্‌তে এবং তাদের সম্বন্ধে চিন্তা ক'র্‌তে পার্‌লে তবেই আমাদের কাজ খাঁটি হ'তে পারে।"

একটি ছেলে ব'ল্‌লে, "প্রথমে আমরা বই থেকে, আমাদের শিক্ষকের কাছ থেকে শিখি, তা'র পরে তাই নিয়ে আমরা পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করি, তা'র পরে সেইগুলি সাধারণকে জানাবার জন্যে যাবার হুকুম হয়।"

সজীব সংবাদপত্র অভিনয় ক'রে আমাকে দেখালে। বিষয়টা হ'চ্চে এদের পাঞ্চবার্ষিক সঙ্কল্প। ব্যাপারটা হ'চ্চে, এরা কঠিন পণ ক'রেচে পাঁচ বছরের মধ্যে সমস্ত দেশকে যন্ত্রশক্তিতে সুদক্ষ ক'রে তুল্‌বে, বিদ্যুৎশক্তি বাষ্পশক্তিকে দেশের এক-ধার থেকে আর এক-ধার পর্য্যন্ত কাজে লাগিয়ে দেবে। এদের দেশ ব'ল্‌তে কেবল য়ুরোপীয় রাশিয়া বোঝায় না। এশিয়ার অনেক দূর পর্য্যন্ত তা'র বিস্তার। সেখানেও নিয়ে যাবে

এদের শক্তির বাহনকে। ধনীকে ধনীতর কর্‌বার জন্যে নয়, জনসমষ্টিকে শক্তিসম্পন্ন কর্‌বার জন্যে—সেই জনসমষ্টির মধ্যে মধ্য-এশিয়ার অসিতচর্ম্ম মানুষও আছে। তা'রাও শক্তির অধিকারী হবে ব'লে ভয় নেই ভাবনা নেই।

এই কাজের জন্যে এদের প্রভূত টাকার দরকার—য়ুরোপীয় বড়ো বাজারে এদের হুণ্ডি চলে না—নগদ দামে কেনা ছাড়া উপায় নেই। তাই পেটের অন্ন দিয়ে এরা জিনিষ কিন্‌চে, উৎপন্ন শস্য, পশুমাংস, ডিম মাখন সমস্ত চালান হ'চ্চে বিদেশের হাটে। সমস্ত দেশের লোক উপবাসের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েচে। এখনও দেড় বছর বাকী। অন্য দেশের মহাজনরা খুসি নয়। বিদেশী এঞ্জিনিয়াররা এদের কলকারখানা অনেক নষ্টও ক'রেচে। ব্যাপারটা বৃহৎ ও জটিল, সময় অত্যন্ত অল্প। সময় বাড়াতে সাহস হয় না, কেননা সমস্ত ধনী-জগতের প্রতিকূলতার মুখে এরা দাঁড়িয়ে, যত শীঘ্র সম্ভব আপন শক্তিতে ধন উৎপাদন এদের পক্ষে নিতান্ত দরকার। তিন বছর কষ্টে কেটে গেচে, এখনও দু-বছর বাকী।

সজীব খবরের কাগজটা অভিনয়ের মতো;—

নেচে গেয়ে পতাকা তুলে' এরা জানিয়ে দিতে চায় দেশের অর্থশক্তিকে যন্ত্রবাহিনী ক'রে ক্রমে ক্রমে কী-পরিমাণে এরা সফলতা লাভ ক'র্‌চে। দেখ্‌বার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। যারা জীবন-যাত্রার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী থেকে বঞ্চিত হ'য়ে বহুকষ্টে কাল কাটাচ্চে তাদের বোঝানো চাই অনতিকালের মধ্যে এই কষ্টের অবসান হবে এবং বদলে যা পাবে তা'র কথা স্মরণ ক'রে যেন তা'রা আনন্দের সঙ্গে, গৌরবের সঙ্গে কষ্টকে বরণ ক'রে নেয়।

এর মধ্যে সান্ত্বনার কথাটা এই যে, কোনো একদল লোক নয় দেশের সকল লোকই একসঙ্গে তপস্যায় প্রবৃত্ত। এই সজীব সংবাদপত্র অন্য দেশের বিবরণও এই রকম ক'রে প্রচার করে। মনে প'ড়্‌লো পতিশরে দেহতত্ত্ব মুক্তিতত্ত্ব নিয়ে এক যাত্রার পালা শুনেছিলুম—প্রণালীটা একই, লক্ষ্যটা আলাদা। মনে ক'র্‌চি দেশে ফিরে গিয়ে শান্তিনিকেতনে সুরুলে সজীব সংবাদপত্র চালাবার চেষ্টা ক'র্‌বো।

ওদের দৈনিক কার্য্যপদ্ধতি হ'চ্চে এই-রকম—সকাল সাতটার সময় ওরা বিছানা থেকে ওঠে। তা'র পর পনেরো মিনিট ব্যায়াম, প্রাতঃকৃত্য, প্রাতরাশ।

আটটার সময় ক্লাস বসে। একটার সময় কিছুক্ষণের জন্য আহার ও বিশ্রাম। বেলা তিনটে পর্য্যন্ত ক্লাস চলে। শেখ্‌বার বিষয় হ'চ্চে—ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, প্রাথমিক প্রাকৃত-বিজ্ঞান, প্রাথমিক রসায়ন, প্রাথমিক জীববিজ্ঞান, যন্ত্রবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সাহিত্য, হাতের কাজ, ছুতোরের কাজ, বই-বাঁধাই, হাল আমলের চাষের যন্ত্র প্রভৃতির ব্যবহার ইত্যাদি। রবিবার নেই। প্রত্যেক পঞ্চম দিনে ছুটি। তিনটের পরে বিশেষ দিনের কার্য্য-তালিকা অনুসারে পায়োনিয়র্‌রা (পুরোযায়ীর দল) কারখানা, হাঁসপাতাল, গ্রাম প্রভৃতি দেখ্‌তে যায়।

পল্লীগ্রামে ভ্রমণ ক'র্‌তে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। মাঝে মাঝে নিজেরা অভিনয় করে, মাঝে মাঝে থিয়েটার দেখ্‌তে সিনেমা দেখ্‌তে যায়। সন্ধ্যাবেলায় গল্প পড়া, গল্প বলা, তর্কসভা, সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক সভা। ছুটির দিনে পাইওনিয়ররা কিছু পরিমাণে নিজেদের কাপড় কাচে, ঘর পরিষ্কার করে, বাড়ি এবং বাড়ির চারিদিক পরিষ্কার করে, ক্লাস-পাঠ্যের অতিরিক্ত পড়া পড়ে, বেড়াতে যায়। ভর্ত্তি হবার বয়েস সাত-আট, বিদ্যালয় ত্যাগ করবার বয়েস ষোলো। এদের

অধ্যয়নকাল আমাদের দেশের মতো লম্বা লম্বা ছুটি দিয়ে ফাঁক ক'রে দেওয়া নয়, সুতরাং অল্পদিনে অনেক বেশি প'ড়্‌তে পারে।

এখানকার বিদ্যালয়ের মস্ত একটা গুণ, এরা যা পড়ে তা'র সঙ্গে সঙ্গে ছবি আঁকে। তাতে পড়ার বিষয় মনে চিত্রিত হ'য়ে ওঠে, ছবির হাত পেকে যায়—আর পড়ার সঙ্গে রূপসৃষ্টি করার আনন্দ মিলিত হয়। হঠাৎ মনে হ'তে পারে এরা বুঝি কেবলই কাজের দিকে ঝোঁক দিয়েচে, গোঁয়ারের মতো ললিতকলাকে অবজ্ঞা করে। একেবারেই তা নয়। সম্রাটের আমলের তৈরি বড়ো বড়ো রঙ্গশালায় উচ্চ অঙ্গের নাটক ও অপেরার অভিনয়ে বিলম্বে টিকিট পাওয়াই শক্ত হয়। নাট্যাভিনয়কলায় এদের মতো ওস্তাদ জগতে অল্পই আছে, পূর্ব্বতন কালে আমীর ওম্‌রাওরাই সে-সমস্ত ভোগ ক'রে এসেচেন—তখনকার দিনে যাদের পায়ে না ছিল জুতো, গায়ে ছিল ময়লা ছেঁড়া কাপড়, আহার ছিল আধপেটা, দেবতা মানুষ সবাইকেই যারা অহোরাত্র ভয় ক'রে ক'রে বেড়িয়েচে, পরিত্রাণের জন্যে পুরুৎপাণ্ডাকে দিয়েচে ঘুষ, আর মনিবের কাছে ধূলোয় মাথা লুটিয়ে আত্মাবমাননা

ক'রেচে তাদেরই ভিড়ে থিয়েটারে জায়গা পাওয়া যায় না।

আমি যে-দিন অভিনয় দেখ্‌তে গিয়েছিলুম সে-দিন হ'চ্ছিলো টলস্‌টয়ের রিসারেক্সান। জিনিষটা জনসাধারণের পক্ষে সহজে উপভোগ্য ব'লে মনে করা যায় না। কিন্তু শ্রোতারা গভীর মনোযোগের সঙ্গে সম্পূর্ণ নিঃশব্দে শুন্‌ছিলো। এংলো-স্যাক্‌সন চাষী মজুর শ্রেণীর লোকে এ-জিনিষ রাত্রি একটা পর্য্যন্ত এমন স্তব্ধ শান্তভাবে উপভোগ ক'র্‌চে এ-কথা মনে করা যায় না, আমাদের দেশের কথা ছেড়েই দাও।

আর একটা উদাহরণ দিই। মস্কৌ শহরে আমার ছবির প্রদর্শনী হ'য়েছিলো। এ-ছবিগুলো সৃষ্টিছাড়া সে-কথা বলা বাহুল্য। শুধু যে বিদেশী তা নয়, বলা চলে যে তা'রা কোনো দেশীই নয়। কিন্তু লোকের ঠেলাঠেলি ভিড়। অল্প কয়দিনে পাঁচ হাজার লোক ছবি দেখেচে। আর যে যা বলুক, অন্তত আমি তো এদের রুচির প্রশংসা না ক'রে থাক্‌তে পার্‌বো না।

রুচির কথা ছেড়ে দাও, মনে করা যাক্ এ-একটা ফাঁকা কৌতূহল। কিন্তু কৌতূহল থাকাটাই যে, জাগ্রত চিত্তের পরিচয়। মনে আছে একদা আমাদের

ইঁদারার জন্যে আমেরিকা থেকে একটা বায়ুচল চক্রযন্ত্র এনেছিলুম, তাতে কূয়োর গভীর তলা থেকে জল উঠেছিলো। কিন্তু যখন দেখ্‌লুম ছেলেদের চিত্তের গভীর তলদেশ থেকে একটুও কৌতূহল টেনে তুল্‌তে পার্‌লে না তখন মনে বড়োই ধিক্কার লাগ্‌লো। এই তো আমাদের ওখানে আছে বৈদ্যুত আলোর কারখানা, ক-জন ছেলের তাতে একটুও ঔৎসুক্য আছে? অথচ এরা তো ভদ্রশ্রেণীর ছেলে। বুদ্ধির জড়তা যেখানে, সেইখানে কৌতূহল দুর্ব্বল।

এখানে ইস্কুলের ছেলেদের আঁকা অনেকগুলি ছবি আমরা পেয়েচি—দেখে বিস্মিত হ'তে হয়—সেগুলো রীতিমতো ছবি, কারও নকল নয়, নিজের উদ্ভাবন। এখানে নির্ম্মাণ এবং সৃষ্টি দুইয়েরই প্রতি লক্ষ্য দেখে নিশ্চিন্ত হ'য়েচি। এখানে এসে অবধি স্বদেশের শিক্ষার কথা অনেক ভাব্‌তে হ'য়েচে। আমার নিঃসহায় সামান্য শক্তি দিয়ে কিছু এর আহরণ এবং প্রয়োগ ক'র্‌তে চেষ্টা ক'র্‌বো। কিন্তু আর সময় কই—আমার পক্ষে পাঞ্চবার্ষিক সঙ্কল্পও হয়তো পূরণ না হ'তে পারে। প্রায় তিরিশ বছর কাল যেমন একা একা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লগি ঠেলে কাটিয়েচি—আরও দু-চার বছর
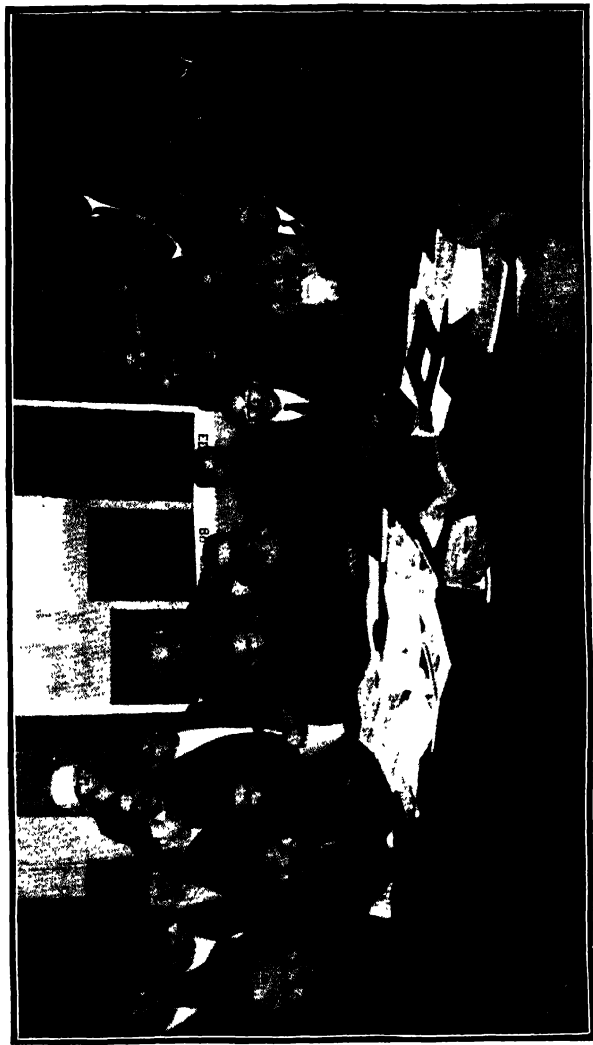
মস্কো কৃষিভবনে রবীন্দ্রনাথ

তেমনি ক'রেই ঠেল্‌তে হবে, বিশেষ এগোবে না তাও জানি—তবু নালিশ ক'র্‌বো না। আজ আর সময় নেই। আজ রাত্রের গাড়িতে জাহাজের ঘাটের অভিমুখে যেতে হবে, সমুদ্রে কাল পাড়ি দেবো। ইতি ১ অক্টোবর, ১৯৩০।

ব্রেমেন ষ্টীমার।
অতলান্তিক।

রাশিয়া থেকে ফিরে এসে আজ চ'লেচি আমেরিকার ঘাটে। কিন্তু রাশিয়ার স্মৃতি আজও আমার সমস্ত মন অধিকার ক'রে আছে। তা'র প্রধান কারণ অন্যান্য যে-সব দেশে ঘুরেচি তা'রা সমগ্রভাবে মনকে নাড়া দেয় না। তাদের নানা কর্ম্মের উদ্যম আছে আপন আপন মহলে। কোথাও আছে পলিটিক্স্‌, কোথাও আছে হাঁসপাতাল, কোথাও আছে বিশ্ব-বিদ্যালয়, কোথাও আছে ম্যুজিয়ম—বিশেষজ্ঞরা তাই নিয়ে কাজ ক'রে যাচ্চে। কিন্তু এখানে সমস্ত দেশটা

এক অভিপ্রায় মনে নিয়ে সমস্ত কর্ম্মবিভাগকে এক স্নায়ুজালে জড়িত ক'রে এক বিরাট দেহ, এক বৃহৎ ব্যক্তিস্বরূপ ধারণ ক'রেচে। সব কিছু মিলে গেচে একটি অখণ্ড সাধনার মধ্যে।

যে-সব দেশে অর্থ এবং শক্তির অধ্যবসায় ব্যক্তিগত স্বার্থদ্বারা বিভক্ত, সেখানে এ-রকম চিত্তের নিবিড় ঐক্য অসম্ভব। যখন এখানে পাঞ্চবার্ষিক য়ুরোপীয় যুদ্ধ চ'লছিলো তখন দায়ে প'ড়ে দেশের অধিকাংশ ভাবনা ও কাজ এক অভিপ্রায়ে মিলিত হ'য়ে এক চিত্তের অধিকারে এসেছিলো, এটা হ'য়েছিলো অস্থায়ীভাবে—কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ায় যে-কাণ্ড চ'ল্‌চে তা'র প্রকৃতিই এই—সাধারণের কাজ, সাধারণের চিত্ত, সাধারণের স্বত্ব ব'লে একটা অসাধারণ সত্তা এরা সৃষ্টি ক'র্‌তে লেগে গেচে।

উপনিষদের একটা কথা আমি এখানে এসে খুব স্পষ্ট ক'রে বুঝেচি—'মা গৃধঃ', লোভ ক'রো না। কেন লোভ ক'র্‌বে না? যে-হেতু সমস্ত-কিছু এক সত্যের দ্বারা পরিব্যাপ্ত—ব্যক্তিগত লোভেতে ক'রেই সেই একের উপলব্ধির মধ্যে বাধা আনে। 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'—সেই একের থেকে যা আস্‌চে তাকেই ভোগ

করো। এরা আর্থিক দিক থেকে সেই কথাটা ব'ল্‌চে। সমস্ত মানবসাধারণের মধ্যে এরা একটি অদ্বিতীয় মানবসত্যকেই বড়ো ব'লে মানে—সেই একের যোগে উৎপন্ন যা-কিছু, এরা বলে তাকেই সকলে মিলে ভোগ করো—'মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং'—কারো ধনে লোভ ক'রো না। কিন্তু ধনের ব্যক্তিগত বিভাগ থাকলেই ধনের লোভ আপনিই হয়। সেইটিকে ঘুচিয়ে দিয়ে এরা ব'ল্‌তে চায় 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।

য়ুরোপে অন্য সকল দেশেরই সাধনা ব্যক্তির লাভকে ব্যক্তির ভোগকে নিয়ে। তা'রই মন্থন আলোড়ন খুবই প্রচণ্ড, আর পৌরাণিক সমুদ্রমন্থনের মতোই তা'র থেকে বিষ ও সুধা দুইই উঠ্‌চে। কিন্তু সুধার ভাগ কেবল একদলই পাচ্চে, অধিকাংশই পাচ্চে না—এই নিয়ে অসুখ অশান্তির সীমা নেই। সবাই মেনে নিয়েছিলো এইটেই অনিবার্য্য—ব'লেছিলো মানবপ্রকৃতির মধ্যেই লোভ আছে—এবং লোভের কাজই হ'চ্চে ভোগের মধ্যে অসমান ভাগ ক'রে দেওয়া। অতএব প্রতিযোগিতা চ'ল্‌বে এবং লড়াইয়ের জন্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা চাই। কিন্তু সোভিয়েটরা যা ব'ল্‌তে চায় তা'র থেকে বুঝ্‌তে হবে মানুষের মধ্যে

ঐক্যটাই সত্য, ভাগটাই মায়া, সম্যক চিন্তা সম্যক চেষ্টাদ্বারা সেটাকে যে-মুহূর্ত্তে মান্‌বো না সেই মুহূর্ত্তেই স্বপ্নের মতো সে লোপ পাবে।

রাশিয়ায় সেই না-মানার চেষ্টা সমস্ত দেশ জুড়ে প্রকাণ্ড ক'রে চ'ল্‌চে। সব-কিছু এই এক-চেষ্টার অন্তর্গত হ'য়ে গেচে। এইজন্যে রাশিয়ায় এসে একটা বিরাট চিত্তের স্পর্শ পাওয়া গেল। শিক্ষার বিরাটপর্ব্ব আর কোনো দেশে এমন ক'রে দেখিনি, তা'র কারণ অন্যদেশে শিক্ষা যে করে শিক্ষার ফল তা'রই--'দুধুভাতু খায় সেই।' এখানে প্রত্যেকের শিক্ষায় সকলের শিক্ষা। একজনের মধ্যে শিক্ষার যে-অভাব হবে সে-অভাব সকলকেই লাগবে। কেননা সম্মিলিত শিক্ষারই যোগে এরা সম্মিলিত মনকে বিশ্বসাধারণের কাজে সফল ক'র্‌তে চায়। এরা 'বিশ্বকর্ম্মা'; অতএব এদের বিশ্বমনা হওয়া চাই, অতএব এদের জন্যেই যথার্থ বিশ্ববিদ্যালয়।

শিক্ষা ব্যাপারকে এরা নানা প্রণালী দিয়ে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্চে। তা'র মধ্যে একটা হ'চ্চে ম্যুজিয়ম। নানাপ্রকার ম্যুজিয়মের জালে এরা সমস্ত গ্রাম শহরকে জড়িয়ে ফেলেচে। সে-ম্যুজিয়ম

আমাদের শান্তিনিকেতনের লাইব্রেরির মতো অকারী নয় (passive)—সকারী (active)।

রাশিয়ায় Region Study অর্থাৎ স্থানিক তথ্য-সন্ধানের উদ্যোগ সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। এ-রকম শিক্ষা-কেন্দ্র প্রায় ২০০০ আছে, তা'র সদস্য-সংখ্যা সত্তর হাজার পেরিয়ে গেচে। এই সব কেন্দ্রে তত্তৎ স্থানের অতীত ইতিহাস এবং অতীত ও বর্ত্তমানের আর্থিক অবস্থার অনুসন্ধান হয়। তা ছাড়া সে-সব জায়গার উৎপাদিকা শক্তি কী-রকম শ্রেণীর কিম্বা কোনো খনিজ পদার্থ সেখানে প্রচ্ছন্ন আছে কী না তা'র খোঁজ হ'য়ে থাকে। এই সব কেন্দ্রের সঙ্গে যে-সব ম্যুজিয়ম আছে তা'রই যোগে সাধারণের শিক্ষাবিস্তার একটা গুরুতর কর্ত্তব্য। সোভিয়েট রাষ্ট্রে সর্ব্বসাধারণের জ্ঞানোন্নতির যে নবযুগ এসেচে, এই স্থানিক তথ্যসন্ধানের ব্যাপক চর্চ্চা এবং তৎসংশ্লিষ্ট ম্যুজিয়ম তা'র একটা প্রধান প্রণালী।

এই রকম নিকটবর্ত্তী স্থানের তথ্যানুসন্ধান শান্তি-নিকেতনে কালীমোহন কিছু পরিমাণে ক'রেচেন—কিন্তু এই কাজের সঙ্গে আমাদের ছাত্র ও শিক্ষকেরা যুক্ত না থাকাতে তাদের এতে কোনো উপকার হয়নি। সন্ধান করবার ফল পাওয়ার চেয়ে সন্ধান করার মন

তৈরি করা কম কথা নয়। কলেজ-বিভাগের ইকনমিক ক্লাসের ছাত্রদের নিয়ে প্রভাত এই রকম চর্চ্চার পত্তন ক'র্‌চেন শুনেছিলুম ; কিন্তু এ-কাজটা আরও বেশি সাধারণভাবে করা দরকার, পাঠভবনের ছেলেদেরও এই কাজে দীক্ষিত করা চাই আর এই সঙ্গে সমস্ত প্রাদেশিক সামগ্রীর ম্যুজিয়ম স্থাপন করা আবশ্যক।

এখানে ছবির ম্যুজিয়মের কাজ কী-রকম চলে তা'র বিবরণ শুন্‌লে নিশ্চয় তোমার ভালো লাগ্‌বে। মস্কৌ শহরে ট্রেটিয়াকভ গ্যালারি নামে (Tretyakov Gallery) এক বিখ্যাত চিত্রভাণ্ডার আছে। সেখানে ১৯২৮ থেকে ১৯২৯ পর্য্যন্ত এক বছরের মধ্যে প্রায় তিনলক্ষ লোক ছবি দেখ্‌তে এসেচে। যত দর্শক আস্‌তে চায় তাদের ধরানো শক্ত হ'য়ে উঠেচে। সেই-জন্যে ছুটির দিনে আগে থাক্‌তে দর্শকদের নাম রেজেষ্ট্রি করানো দরকার হ'য়েচে।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট-শাসন প্রবর্ত্তিত হবার পূর্ব্বে যে-সব দর্শক এই রকম গ্যালারিতে আস্‌তো তা'রা ধনী মানী জ্ঞানী দলের লোক এবং তা'রা, যাদের এরা বলে bourgeoisie, অর্থাৎ পরশ্রমজীবী। এখন আসে অসংখ্য স্বশ্রমজীবীর দল, যথা রাজমিস্ত্রি,

লোহার, মুদী, দর্জ্জি ইত্যাদি। আর আসে সোভিয়েট সৈনিক, সেনানায়ক, ছাত্র এবং চাষী সম্প্রদায়।

আর্টের বোধ ক্রমে ক্রমে এদের মনে জাগিয়ে তোলা আবশ্যক। এদের মতো আনাড়িদের পক্ষে চিত্রকলার রহস্য প্রথম দৃষ্টিতে ঠিকমতো বোঝা অসাধ্য। দেয়ালে দেয়ালে ছবি দেখে দেখে এরা ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, বুদ্ধি যায় পথ হারিয়ে। এই কারণে প্রায় সব ম্যুজিয়মেই উপযুক্ত পরিচায়ক রেখে দেওয়া হ'য়েচে। ম্যুজিয়মের শিক্ষাবিভাগে কিম্বা অন্যত্র তদনুরূপ রাষ্ট্র-কর্ম্মশালায় যে-সমস্ত বৈজ্ঞানিক কর্ম্মী আছে তাদেরই মধ্যে থেকে পরিচায়ক বাছাই ক'রে নেওয়া হয়। যারা দেখ্‌তে আসে তাদের সঙ্গে এদের দেনাপাওনার কোনো কারবার থাকে না। ছবিতে যে-বিষয়টা প্রকাশ ক'র্‌চে সেইটে দেখলেই-যে ছবি দেখা হয়, দর্শকেরা যাতে সেই ভুল না করে পরিদর্শয়িতার সেটা জানা চাই।

চিত্রবস্তুর সংস্থান (composition), তা'র বর্ণ-কল্পনা (colour scheme), তা'র অঙ্কন, তা'র অবকাশ (space), তা'র উজ্জ্বলতা (illumination), যাতে ক'রে তা'র বিশেষ সম্প্রদায় ধরা পড়ে সেই তা'র বিশেষ আঙ্গিক (technique), এ-সকল বিষয়ে আজও অল্প

লোকেরই জানা আছে। এই জন্যে পরিচায়কের বেশ দস্তুরমতো শিক্ষা থাকা চাই, তবেই দর্শকদের ঔৎসুক্য ও মনোযোগ সে জাগিয়ে রাখ্‌তে পারে। আর একটি কথা তাকে বুঝ্‌তে হবে, ম্যুজিয়মে কেবল একটিমাত্র ছবি নেই, অতএব একটা ছবিকে চিনে নেওয়া দর্শকের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়, ম্যুজিয়মে যে-সব বিশেষ শ্রেণীর ছবি রক্ষিত আছে তাদের শ্রেণীগত রীতি বোঝা চাই। পরিচায়কের কর্ত্তব্য কয়েকটি ক'রে বিশেষ ছাঁদের ছবি বেছে নিয়ে তাদের প্রকৃতি বুঝিয়ে দেওয়া। আলোচ্য ছবিগুলির সংখ্যা খুব বেশি হ'লে চ'ল্‌বে না এবং সময়ও বিশ মিনিটের বেশি হওয়া ঠিক নয়। ছবির যে-একটি স্বকীয় ভাষা, একটি ছন্দ আছে, সেই-টেই বুঝিয়ে দেবার বিষয়, ছবির রূপের সঙ্গে ছবির বিষয়ের ও ভাবের সম্বন্ধ কী সেইটে ব্যাখ্যা করা দরকার। ছবির পরস্পর বৈপরীত্য দ্বারা তাদের বিশেষত্ব বোঝানো অনেক সময় কাজে লাগে। কিন্তু দর্শকের মন একটুমাত্র শ্রান্ত হ'লেই তাদের তখনি ছুটি দেওয়া চাই।

অশিক্ষিত দর্শকদের এরা কী ক'রে ছবি দেখ্‌তে শেখায় তা'রই একটা রিপোর্ট থেকে উল্লিখিত কথাগুলি

তোমাকে সংগ্রহ ক'রে পাঠালুম। এর থেকে আমাদের দেশের লোকের যেটি ভাববার কথা আছে সেটি হ'চ্চে এই:—পূর্ব্বে যে-চিঠি লিখেচি তাতে আমি ব'লেচি, সমস্ত দেশকে কৃষিবলে যন্ত্রবলে অতিদ্রুত মাত্রায় শক্তিমান ক'রে তোল্‌বার জন্যে এরা একান্ত উদ্যমের সঙ্গে লেগে গেচে। এটা ঘোরতর কেজো কথা। অন্য সব ধনী দেশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিজের জোরে টিঁকে থাক্‌বার জন্যে এদের এই বিপুল সাধনা।

আমাদের দেশে যখন এই-জাতীয় দেশব্যাপী রাষ্ট্রিক সাধনার কথা ওঠে তখনি আমরা ব'ল্‌তে সুরু করি এই একটিমাত্র লাল মশাল জ্বালিয়ে তুলে' দেশের অন্য সকল বিভাগের সকল আলো নিবিয়ে দেওয়া চাই, নইলে মানুষ অন্যমনস্ক হবে। বিশেষত ললিতকলা সকল প্রকার কঠোর সঙ্কল্পের বিরোধী। স্বজাতিকে পালোয়ানি কর্‌বার জন্যে কেবলি তাল ঠুকিয়ে পঁয়তারা করাতে হবে, সরস্বতীর বীণাটাকে নিয়ে যদি লাঠি বানানো সম্ভব হয় তবেই সেটা চল্‌বে নতুবা নৈব নৈব চ। এই কথাগুলো যে কতখানি মেকি পৌরুষের কথা তা এখানে এলে স্পষ্ট বোঝা যায়। এখানে এরা দেশজুড়ে কারখানা চালাতে যে-সব শ্রমিকদের পাকা

ক'রে তুল্‌তে চায়, তা'রাই যাতে শিক্ষিত মন নিয়ে ছবির রস বুঝ্‌তে পারে তা'রই জন্যে এত প্রভূত আয়োজন। এরা জানে রসজ্ঞ যারা নয় তা'রা বর্ব্বর, যারা বর্ব্বর তা'রা বাইরে রুক্ষ, অন্তরে দুর্ব্বল। রাশিয়ায় নব-নাট্যকলার অসামান্য উন্নতি হ'য়েচে। এদের ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরতর দুর্দ্দিন দুর্ভিক্ষের মধ্যেই এরা নেচেচে, গান গেয়েচে, নাট্যাভিনয় ক'রেচে—এদের ঐতিহাসিক বিরাট নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে তা'র কোনো বিরোধ ঘটেনি।

মরুভূমিতে শক্তি নেই। শক্তির যথার্থ রূপ দেখা যায় সেইখানেই যেখানে পাথরের বুক থেকে জলের ধারা কল্লোলিত হ'য়ে বেরিয়ে আসে, যেখানে বসন্তের রূপহিল্লোলে হিমাচলের গাম্ভীর্য্য মনোহর হ'য়ে ওঠে। বিক্রমাদিত্য ভারতবর্ষ থেকে শক শত্রুদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু কালিদাসকে নিষেধ করেন নি মেঘদূত লিখ্‌তে। জাপানীরা তলোয়ার চালাতে পারে না এ-কথা বল্‌বার জো নেই, কিন্তু সমান নৈপুণ্যেই তা'রা তুলিও চালায়। রাশিয়ায় এসে যদি দেখ্‌তুম এরা কেবলি মজুর সেজে কারখানা-ঘরের সরঞ্জাম জোগাচ্চে আর লাঙল চালাচ্চে, তাহ'লেই বুঝতুম এরা

শুকিয়ে ম'র্‌বে। যে-বনস্পতি পল্লবমর্ম্মর বন্ধ ক'রে দিয়ে খট্‌ খট্‌ আওয়াজে অহঙ্কার ক'রে ব'ল্‌তে থাকে, আমার রসের দরকার নেই, সে নিশ্চয়ই ছুতোরের দোকানের নকল বনস্পতি—সে খুবই শক্ত হ'তে পারে কিন্তু খুবই নিষ্ফল। অতএব আমি বীরপুরুষদের ব'লে রাখ্‌চি এবং তপস্বীদের সাবধান ক'রে দিচ্চি যে, দেশে যখন ফিরে যাবো পুলিসের যষ্টিধারার শ্রাবণবর্ষণেও আমার নাচ গান বন্ধ হবে না।

রাশিয়ায় নাট্যমঞ্চে যে কলা-সাধনার বিকাশ হ'য়েচে, সে অসামান্য। তা'র মধ্যে নূতন সৃষ্টির সাহস ক্রমাগতই দেখা দিচ্চে, এখনো থামেনি। ওখানকার সমাজবিপ্লবে এই নূতন সৃষ্টিরই অসমসাহস কাজ ক'রেচে। এরা সমাজে রাষ্ট্রে কলাতত্ত্বে কোথাও নূতনকে ভয় করেনি।

যে পুরাতন ধর্ম্মতন্ত্র এবং পুরাতন রাষ্ট্রতন্ত্র বহুশতাব্দী ধ'রে এদের বুদ্ধিকে অভিভূত এবং প্রাণশক্তিকে নিঃশেষপ্রায় ক'রে দিয়েচে, এই সোভিয়েট-বিপ্লবীরা তাদের দুটোকেই দিয়েচে নির্ম্মূল ক'রে, এত বড়ো বন্ধনজর্জ্জর জাতিকে এত অল্পকালে এত বড়ো মুক্তি দিয়েচে দেখে মন আনন্দিত হয়। কেননা, যে-ধর্ম্ম

মূঢ়তাকে বাহন ক'রে মানুষের চিত্তের স্বাধীনতা নষ্ট করে, কোনো রাজাও তা'র চেয়ে আমাদের বড়ো শত্রু হ'তে পারে না—সে রাজা বাইরে থেকে প্রজাদের স্বাধীনতাকে যতই নিগড়বদ্ধ করুক না। এ পর্য্যন্ত দেখা গেচে, যে-রাজা প্রজাকে দাস ক'রে রাখ্‌তে চেয়েচে সে-রাজার সর্ব্বপ্রধান সহায় সেই ধর্ম্ম যা মানুষকে অন্ধ ক'রে রাখে। সে-ধর্ম্ম বিষকন্যার মতো: আলিঙ্গন ক'রে সে মুগ্ধ করে, মুগ্ধ ক'রে সে মারে। শক্তিশেলের চেয়ে ভক্তিশেল গভীরতর মর্ম্মে গিয়ে প্রবেশ করে, কেননা তা'র মার আরামের মার।

সোভিয়েটরা রুশসম্রাটকৃত অপমান এবং আত্মকৃত অপমানের হাত থেকে এই দেশকে বাঁচিয়েচে—অন্য দেশের ধার্ম্মিকেরা ওদের যত নিন্দাই করুক আমি নিন্দা ক'র্‌তে পার্‌বো না। ধর্ম্মমোহের চেয়ে নাস্তিকতা অনেক ভালো। রাশিয়ার বুকের 'পরে ধর্ম্ম ও অত্যাচারী রাজার পাথর চাপা ছিল; দেশের উপর থেকে সেই পাথর ন'ড়ে যাওয়ায় কী প্রকাণ্ড নিষ্কৃতি হ'য়েচে, এখানে এলে সেটা স্বচক্ষে দেখ্‌তে পেতে। ইতি ৩রা অক্টোবর ১৯৩০।

৮

অতলান্তিক মহাসাগর

রাশিয়া থেকে ফিরে এসেচি, চ'লেচি আমেরিকার পথে। রাশিয়া-যাত্রায় আমার একটিমাত্র উদ্দেশ্য ছিল—ওখানে জনসাধারণের শিক্ষাবিস্তারের কাজ কী-রকম চ'ল্‌চে আর ওরা তা'র ফল কী-রকম পাচ্চে সেইটে অল্পসময়ের মধ্যে দেখে নেওয়া।

আমার মত এই যে, ভারতবর্ষের বুকের উপর যত কিছু দুঃখ আজ অভ্রভেদী হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে তা'র একটিমাত্র ভিত্তি হ'চ্চে অশিক্ষা। জাতিভেদ, ধর্ম্ম-বিরোধ, কর্ম্মজড়তা, আর্থিক দৌর্ব্বল্য—সমস্তই আঁক্‌ড়ে আছে এই শিক্ষার অভাবকে। সাইমন কমিশনে ভারতবর্ষের সমস্ত অপরাধের তালিকা শেষ ক'রে ব্রিটিশ শাসনের কেবল একটিমাত্র অপরাধ কবুল ক'রেচে। সে হ'চ্চে যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষাবিধানের ত্রুটি। কিন্তু আর কিছু বল্‌বার দরকার ছিল না। মনে করুন যদি বলা হয়, গৃহস্থ সাবধান হ'তে শেখেনি, এক ঘর থেকে আর এক ঘরে যেতে চৌকাঠে হুঁচট

লেগে সে আছাড় খেয়ে পড়ে, জিনিষপত্র কেবলি হারায় তা'র পরে খুঁজে পায় না, ছায়া দেখ্‌লে তাকে জুজু ব'লে ভয় করে, নিজের ভাইকে দেখে চোর এসেচে ব'লে লাঠি উঁচিয়ে মার্‌তে যায়—কেবলি বিছানা আঁক্‌ড়ে প'ড়ে থাকে, উঠে হেঁটে বেড়াবার সাহসই নেই, ক্ষিধে পায় কিন্তু খাবার কোথায় আছে খুঁজে পায় না, অদৃষ্টের উপর অন্ধ নির্ভর ক'রে থাকা ছাড়া অন্য সমস্ত পথ তা'র কাছে লুপ্ত—অতএব নিজের গৃহস্থালির তদারকের ভার তা'র উপর দেওয়া চলে না—তারপরে সব-শেষে গলা অত্যন্ত খাটো ক'রে যদি বলা হয়, আমি ওর বাতি নিবিয়ে রেখেচি, তাহ'লে সেটা কেমন হয় ?

ওরা একদিন ডাইনী ব'লে নিরপরাধাকে পুড়িয়েচে, পাপিষ্ঠ ব'লে বৈজ্ঞানিককে মেরেচে,ধর্ম্মমতের স্বাতন্ত্র্যকে অতি নিষ্ঠুরভাবে পীড়ন ক'রেচে, নিজেরই ধর্ম্মের ভিন্ন সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রাধিকারকে খর্ব্ব ক'রে রেখেচে, এ ছাড়া কত অন্ধতা কত মূঢ়তা কত কদাচার মধ্য-যুগের ইতিহাস থেকে তা'র তালিকা স্তূপাকার ক'রে তোলা যায়—এ সমস্ত দূর হ'লো কী ক'রে ? বাইরে-কার কোনো কোর্ট অফ ওয়ার্ড্‌সের হাতে ওদের অক্ষমতার সংস্কার-সাধনের ভার দেওয়া হয়নি, একটি-

মাত্র শক্তি ওদের এগিয়ে দিয়েচে, সে হ'চ্চে ওদের শিক্ষা।

জাপান এই শিক্ষার যোগেই অল্প কালের মধ্যেই দেশের রাষ্ট্রশক্তিকে সর্ব্বসাধারণের ইচ্ছা ও চেষ্টার সঙ্গে যুক্ত ক'রে দিয়েচে, দেশের অর্থ উৎপাদনের শক্তিকে বহুগুণে বাড়িয়ে তুলেচে; বর্ত্তমান তুরুস্ক প্রবল বেগে এই শিক্ষা অগ্রসর ক'রে দিয়ে ধর্ম্মান্ধতার প্রবল বোঝা থেকে দেশকে মুক্ত কর্‌বার পথে চ'লেচে। "ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।" কেননা ঘরে আলো আস্‌তে দেওয়া হয়নি,—যে-আলোতে আজকের পৃথিবী জেগে, সেই শিক্ষার আলো ভারতের রুদ্ধদ্বারের বাইরে।

রাশিয়ায় যখন যাত্রা ক'র্‌লুম খুব বেশি আশা করিনি। কেননা কতটা সাধ্য এবং অসাধ্য তা'র আদর্শ ব্রিটিশ ভারতবর্ষ থেকেই আমি পেয়েচি। ভারতের উন্নতিসাধনের দুরূহতা যে কত বেশি সে-কথা স্বয়ং খৃষ্টান পাদ্রি টম্‌সন্ অতি করুণস্বরে সমস্ত পৃথিবীর কাছে জানিয়েচেন। আমাকেও মান্‌তে হ'য়েচে দুরূহতা আছে বই কি, নইলে আমাদের এমন দশা হবেই বা কেন? একটা কথা আমার জানা ছিল, রাশিয়ায় প্রজাসাধারণের উন্নতিবিধান ভারতবর্ষের

চেয়ে বেশি দুরূহ বই কম নয়। প্রথমত এখানকার সমাজে যারা ভদ্রেতর শ্রেণীতে ছিল আমাদের দেশের সেই শ্রেণীর লোকের মতোই তাদের অন্তর বাহিরের অবস্থা। সেই রকমই নিরক্ষর নিরুপায়, পূজা অর্চ্চনা পুরুত পাণ্ডা দিনক্ষণ তাগাতাবিজে বুদ্ধিশুদ্ধি সমস্ত চাপা-পড়া, উপরিওয়ালাদের পায়ের ধূলোতেই মলিন তাদের আত্মসম্মান, আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের সুযোগ সুবিধা তা'রা কিছুই পায়নি, প্রপিতামহদের ভূতে পাওয়া তাদের ভাগ্য, সেই ভূত তাদের বেঁধে রেখেচে হাজার বছরের আগেকার অচল খোঁটায়, মাঝে মাঝে য়িহুদী প্রতিবেশীদের 'পরে খুন চেপে যায় তখন পাশবিক নিষ্ঠুরতার আর অন্ত থাকে না। উপর-ওয়ালাদের কাছ থেকে চাবুক খেতে যেমন মজবুৎ, নিজেদের সমশ্রেণীর প্রতি অন্যায় অত্যাচার ক'র্‌তে তা'রা তেম্‌নি প্রস্তুত।

এই তো হ'লো ওদের দশা,—বর্ত্তমানে যাদের হাতে ওদের ভাগ্য, ইংরেজের মতো তা'রা ঐশ্বর্য্য-শালী নয়, কেবলমাত্র ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের পর থেকে নিজের দেশে তাদের অধিকার আরম্ভ হ'য়েচে—রাষ্ট্রব্যবস্থা আটেঘাটে পাকা হবার মতো সময় এবং

V. O. K. S.-এর প্রেসিডেন্ট্‌ অধ্যাপক পেট্রভ ও রবীন্দ্রনাথ

সম্বল তা'রা পায়নি—ঘরে-বাইরে প্রতিকূলতা -তাদের মধ্যে আত্মবিদ্রোহ সমর্থন কর্‌বার জন্যে ইংরেজ এমন কি আমেরিকান্‌রাও গোপনে ও প্রকাশ্যে চেষ্টা ক'রেচে। জনসাধারণকে সক্ষম ও শিক্ষিত ক'রে তোলবার জন্যে তা'রা যে পণ ক'রেচে তা'র "ডিফি-কাল্‌টি" ভারতকর্ত্তৃপক্ষের ডিফিকাল্‌টির চেয়ে বহু গুণে বড়ো।

অতএব রাশিয়ায় গিয়ে বেশি কিছু দেখ্‌তে পাবো এ-রকম আশা করা অন্যায় হ'তো। কী-ই বা জানি কী-ই বা দেখেচি যাতে আমাদের আশার জোর বেশি হ'তে পারে! আমাদের দুঃখী-দেশে লালিত অতি দুর্ব্বল আশা নিয়েই রাশিয়ায় গিয়েছিলুম। গিয়ে যা দেখ্‌লুম তাতে বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়েচি। Law and order কী পরিমাণে রক্ষিত হ'চ্চে বা না হ'চ্চে তা'র তদন্ত কর্‌বার যথেষ্ট সময় পাইনি—শোনা যায় যথেষ্ট জবরদস্তি আছে, বিনা বিচারে দ্রুত পদ্ধতিতে শাস্তি, সেও চলে, আর-সব বিষয়ে স্বাধীনতা আছে কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের বিধানের বিরুদ্ধে নেই। এটা তো হ'লো চাঁদের কলঙ্কের দিক কিন্তু আমার দেখ্‌বার প্রধান লক্ষ্য ছিল আলোকের দিক্‌। সে-দিকটাতে

যে-দীপ্তি দেখা গেল সে অতি আশ্চর্য্য—যারা একেবারেই অচল ছিল তা'রা সচল হ'য়ে উঠেচে।

শোনা যায় য়ুরোপের কোনো কোনো তীর্থস্থানে দৈবকৃপায় একমুহূর্ত্তে চিরপঙ্গু তা'র লাঠি ফেলে এসেচে—এখানে তাই হ'লো; দেখতে দেখতে খুঁড়িয়ে চল্‌বার লাঠি দিয়ে এরা ছুটে চল্‌বার রথ বানিয়ে নিচ্চে—পদাতিকের অধম যারা ছিল তা'রা বছর দশেকের মধ্যে হ'য়ে উঠেচে রথী। মানবসমাজে তা'রা মাথা তুলে দাঁড়িয়েচে, তাদের বুদ্ধি স্ববশ, তাদের হাত হাতিয়ার স্ববশ।

আমাদের সম্রাট-বংশীয় খৃষ্টান পাদ্রিরা বহুকাল ভারতবর্ষে কাটিয়েচেন, ডিফিকাল্‌টিস্ যে কী-রকম অনড় তা তাঁরা দেখে এসেচেন। একবার তাঁদের মস্কৌ আসা উচিত। কিন্তু এলে বিশেষ ফল হবে না—কারণ বিশেষ ক'রে কলঙ্ক দেখাই তাঁদের ব্যবসাগত অভ্যাস, আলো চোখে পড়ে না, বিশেষত যাদের উপর বিরাগ আছে। ভুলে যান তাঁদের শাসনচন্দ্রেও কলঙ্ক খুঁজে বের ক'র্‌তে বড়ো চশমার দরকার করে না।

প্রায় সত্তর বছর আমার বয়স হ'লো—এতকাল আমার ধৈর্য্যচ্যুতি হয়নি। নিজেদের দেশের অতি দুর্ব্বহ মূঢ়তার বোঝার দিকে তাকিয়ে নিজের ভাগ্যকেই বেশি

ক'রে দোষ দিয়েচি। অতি সামান্য শক্তি নিয়ে অতি সামান্য প্রতিকারের চেষ্টাও ক'রেচি কিন্তু জীর্ণ আশার রথ যত মাইল চ'লেচে তা'র চেয়ে বেশি সংখ্যায় দড়ি ছিঁড়েচে, চাকা ভেঙেচে। দেশের হতভাগাদের দুঃখের দিকে তাকিয়ে সমস্ত অভিমান বিসর্জ্জন দিয়েচি। কর্ত্তৃপক্ষের কাছে সাহায্য চেয়েচি, তাঁরা বাহবাও দিয়েচেন, যেটুকু ভিক্ষে দিয়েচেন তাতে জাত যায় পেট ভরে না। সব চেয়ে দুঃখ এবং লজ্জার কথা এই যে, তাঁদের প্রসাদলালিত আমাদের স্বদেশী জীবরাই সব চেয়ে বাধা দিয়েচে। যে-দেশ পরের কর্ত্তৃত্বে চালিত সেই দেশে সব চেয়ে গুরুতর ব্যাধি হ'লো এই— সে-সব জায়গায় দেশের লোকের মনে যে ঈর্ষা, যে ক্ষুদ্রতা, যে স্বদেশ-বিরুদ্ধতার কলুষ জন্মায় তা'র মতো বিষ নেই।

বাইরের সকল কাজের উপরেও একটা জিনিষ আছে যেটা আত্মার সাধনা। রাষ্ট্রিক আর্থিক নানা গোলমালে যখন মনটা আবিল হ'য়ে ওঠে তখন তাকে স্পষ্ট দেখ্‌তে পাই নে ব'লেই তা'র জোর ক'মে যায়। আমার মধ্যে সে বিপদ আছে, সেইজন্যেই আসল জিনিষকে আঁকড়ে ধ'রতে চাই। কেউ-বা

আমাকে উপহাস করে, কেউ-বা আমার উপর রাগ করে, তাদের নিজের পথেই আমাকে টেনে নিতে চায়। কিন্তু কোথা থেকে জানিনে আমি এসেচি এই পৃথিবীর তীর্থে, আমার পথ আমার তীর্থ-দেবতার বেদীর কাছে। মানুষের দেবতাকে স্বীকার ক'রে এবং প্রণাম ক'রে যাবো আমার জীবন-দেবতা আমাকে সেই মন্ত্র দিয়েচেন। যখন আমি সেই দেবতার নির্ম্মাল্য ললাটে প'রে যাই তখন সব জাতের লোকই আমাকে ডেকে আসন দেয়, আমার কথা মন দিয়ে শোনে। যখন ভারতবর্ষীয়ের মুখোস প'রে দাঁড়াই তখন বাধা বিস্তর। যখন আমাকে এরা মানুষরূপে দেখে, তখনি এরা আমাকে ভারতবর্ষীয় রূপেই শ্রদ্ধা করে; যখন নিছক ভারতবর্ষীয় রূপে দেখা দিতে চাই তখন এরা আমাকে মানুষরূপে সমাদর ক'র্‌তে পারে না। আমার স্বধর্ম্ম পালন ক'র্‌তে গিয়ে আমার চল্‌বার পথ ভুল বোঝার দ্বারা বন্ধুর হ'য়ে ওঠে। আমার পৃথিবীর মেয়াদ সঙ্কীর্ণ হ'য়ে এসেচে; অতএব আমাকে সত্য হবার চেষ্টা ক'র্‌তে হবে, প্রিয় হবার নয়।

আমার এখানকার খবর সত্য মিথ্যা নানাভাবে দেশে গিয়ে পৌঁছয়। সে-সম্বন্ধে সব সময় উদাসীন

থাক্‌তে পারিনে ব'লে নিজের উপর ধিক্কার জন্মে। বার-বার মনে হয়, বাণপ্রস্থের বয়সে সমাজস্থের মতো ব্যবহার ক'র্‌তে গেলে বিপদে প'ড়্‌তে হয়।

যাই হোক এ-দেশের "এনর্ম্মাস্ ডিফিকাল্‌টিজে"র কথা বইয়ে প'ড়েছিলুম, কানে শুনেছিলুম, কিন্তু সেই ডিফিকাল্টিজ অতিক্রমনের চেহারা চোখে দেখ্‌লুম। ইতি ৪ অক্টোবর, ১৯৩০।

৯

"ব্রেমেন" জাহাজ

আমাদের দেশে পলিটিক্স্‌কে যারা নিছক পালো-য়ানি ব'লে জানে সব রকম ললিতকলাকে তা'রা পৌরু-ষের বিরোধী ব'লে ধ'রে রেখেচে। এ সম্বন্ধে আমি আগেই লিখেচি। রাশিয়ার জার ছিল একদিন দশা-ননের মতো সম্রাট্, তা'র সাম্রাজ্য পৃথিবীর অনেক-খানিকেই অজগর সাপের মতো গিলে ফেলেছিলো, ল্যাজের পাকে যাকে সে জড়িয়েচে তা'র হাড়গোড় দিয়েচে পিষে।

প্রায় বছর তেরো হ'লো এরই প্রতাপের সঙ্গে বিপ্লবীদের ঝুটোপুটি বেধে গিয়েছিলো। সম্রাট যখন

গুষ্ঠিসুদ্ধ গেল স'রে তখনো তা'র সাঙ্গপাঙ্গরা দাপিয়ে বেড়াতে লাগ্‌লো, তাদের অস্ত্র এবং উৎসাহ জোগালে অপর সাম্রাজ্যভোগীরা। বুঝ্‌তেই পার্‌চো ব্যাপারখানা সহজ ছিল না। একদা যারা ছিল সম্রাটের উপগ্রহ, ধনীর দল, চাষীদের 'পরে যাদের ছিল অসীম প্রভুত্ব, তাদের সর্ব্বনাশ বেধে গেল। লুটপাট কাড়াকাড়ি চ'ল্‌লো, তাদের বহুমূল্য ভোগের সামগ্রী ছারখার কর্‌বার জন্যে প্রজারা হন্যে হ'য়ে উঠেচে। এত বড়ো উচ্ছৃঙ্খল উৎপাতের সময় বিপ্লবী নেতাদের কাছ থেকে কড়া হুকুম এসেচে—আর্ট সামগ্রীকে কোনোমতে যেন নষ্ট হ'তে দেওয়া না হয়। ধনীদেব পরিত্যক্ত প্রাসাদ থেকে ছাত্ররা অধ্যাপকেরা অর্দ্ধ-অভুক্ত শীতক্লিষ্ট অবস্থায় দল বেঁধে যা-কিছু রক্ষা-যোগ্য জিনিষ সমস্ত উদ্ধার ক'রে য়ুনিভার্সিটির ম্যুজিয়মে সংগ্রহ ক'র্‌তে লাগ্‌লো।

মনে আছে আমরা যখন চীনে গিয়েছিলুম কী দেখেছিলুম। য়ুরোপের সাম্রাজ্যভোগীরা পিকিনের বসন্ত-প্রাসাদকে কী-রকম ধূলিসাৎ ক'রে দিয়েচে, বহু যুগের অমূল্য শিল্পসামগ্রী কী-রকম লুটেপুটে ছিঁড়ে ভেঙে দিয়েচে উড়িয়ে পুড়িয়ে। তেমন সব জিনিষ জগতে আর কোনোদিন তৈরি হ'তেই পারবে না।

সোভিয়েটরা ব্যক্তিগতভাবে ধনীকে বঞ্চিত ক'রেচে, কিন্তু যে-ঐশ্বর্য্যে সমস্ত মানুষের চিরদিনের অধিকার, বর্ব্বরের মতো তাকে নষ্ট হ'তে দেয় নি। এতদিন যারা পরের ভোগের জন্যে জমি চাষ ক'রে এসেচে এরা তাদের যে কেবল জমির সত্ব দিয়েচে তা নয়, জ্ঞানের জন্যে আনন্দের জন্যে মানবজীবনে যা-কিছু মূল্যবান সমস্ত তাদের দিতে চেয়েচে ; শুধু পেটের ভাত পশুর পক্ষে যথেষ্ট, মানুষের পক্ষে নয়—এ-কথা তা'রা বুঝেছিলো এবং প্রকৃত মনুষ্যত্বের পক্ষে পালোয়ানির চেয়ে আর্টের অনুশীলন অনেক বড়ো এ-কথা তা'রা স্বীকার ক'রেচে।

এদের বিপ্লবের সময় উপর-তলার অনেক জিনিষ নীচে তলিয়ে গেচে এ-কথা সত্য, কিন্তু টিঁকে র'য়েচে এবং ভ'রে উঠেচে ম্যুজিয়ম, থিয়েটর, লাইব্রেরি, সঙ্গীতশালা।

আমাদের দেশের মতোই একদা এদের গুণীর গুণপনা প্রধানত ধর্ম্মমন্দিরেই প্রকাশ পেতো। মোহন্তেরা নিজের স্থূল রুচি নিয়ে তা'র উপরে যেমন-খুসি হাত চালিয়েচে। আধুনিক শিক্ষিত ভক্ত বাবুরা পুরীর মন্দিরকে যেমন চূণকাম ক'র্‌তে সঙ্কুচিত হয় নি, তেমনি এখানকার মন্দিরের কর্ত্তারা আপন সংস্কার

অনুসারে সংস্কৃত ক'রে প্রাচীন কীর্ত্তিকে অবাধে আচ্ছন্ন ক'রে দিয়েচে—তা'র ঐতিহাসিক মূল্য যে সর্ব্বজনের সর্ব্বকালের পক্ষে এ-কথা তা'রা মনে করেনি, এমন কি পুরোনো পূজোর পাত্রগুলিকে নূতন ক'রে ঢালাই ক'রেচে। আমাদের দেশেও মঠে মন্দিরে অনেক জিনিষ আছে ইতিহাসের পক্ষে যা মূল্যবান। কিন্তু কারো তা ব্যবহার কর্‌বার জো নেই—মোহন্তেরাও অতলস্পর্শ মোহে মগ্ন—সেগুলিকে ব্যবহার কর্‌বার মতো বুদ্ধি ও বিদ্যার ধার ধারে না, ক্ষিতিবাবুর কাছে শোনা যায় প্রাচীন অনেক পুঁথি মঠে মঠে আটক্ প'ড়ে আছে, দৈত্যপুরীতে রাজকন্যার মতো, উদ্ধার কর্‌বার উপায় নেই।

বিপ্লবীরা ধর্ম্মমন্দিরের সম্পত্তির বেড়া ভেঙে দিয়ে সমস্তকেই সাধারণের সম্পত্তি ক'রে দিয়েচে। যেগুলি পূজার সামগ্রী সেগুলি রেখে বাকি সমস্ত জমা করা হ'চ্চে ম্যুজিয়মে। একদিকে যখন আত্মবিপ্লব চ'ল্‌চে, যখন চারিদিকে টাইফয়িডের প্রবল প্রকোপ, রেলের পথ সব উৎখাত, সেই সময়ে বৈজ্ঞানিক সন্ধানীর দল গিয়েচে প্রত্যন্ত প্রদেশ সমস্ত হাৎড়িয়ে পুরাকালীন্ শিল্পসামগ্রী উদ্ধার কর্‌বার জন্যে। কত পুঁথি, কত ছবি, কত খোদকারীর কাজ সংগ্রহ হ'লো তা'র সীমা নেই।

এ তো গেল ধনীগৃহে বা ধর্ম্মমন্দিরে যা-কিছু পাওয়া গেচে তা'রই কথা। দেশের সাধারণ চাষীদের কর্ম্মিকদের কৃত শিল্পসামগ্রী, পূর্ব্বতন কালে যা অবজ্ঞা-ভাজন ছিল, তা'র মূল্য নিরূপণ কর্‌বার দিকেও দৃষ্টি প'ড়েচে। শুধু ছবি নয়, লোকসাহিত্য লোকসঙ্গীত প্রভৃতি নিয়েও প্রবলবেগে কাজ চ'ল্‌চে।

এই তো গেল সংগ্রহ, তা'র পরে এই সমস্ত সংগ্রহ নিয়ে লোকশিক্ষার ব্যবস্থা। ইতিপূর্ব্বেই তা'র বিবরণ লিখেচি। এত কথা যে তোমাকে লিখ্‌চি তা'র কারণ এই, দেশের লোককে আমি জানাতে চাই, আজ কেবলমাত্র দশ বছরের আগেকার রাশিয়ার জনসাধারণ আমাদের বর্ত্তমান জনসাধারণের সমতুল্যই ছিল; সোভিয়েট শাসনে এই জাতীয় লোককেই শিক্ষার দ্বারা মানুষ ক'রে তোল্‌বার আদর্শ কতখানি উচ্চ। এর মধ্যে বিজ্ঞান সাহিত্য সঙ্গীত চিত্রকলা সমস্তই আছে,—অর্থাৎ আমাদের দেশের ভদ্রনামধারীদের জন্যে শিক্ষার যে-আয়োজন তা'র চেয়ে অনেক গুণেই সম্পূর্ণতর।

কাগজে প'ড়্‌লুম সম্প্রতি দেশে প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন-উপলক্ষ্যে হুকুম পাস হ'য়েচে প্রজাদের

কান ম'লে শিক্ষা-কর আদায় করা, এবং আদায়ের ভার প'ড়েচে জমিদারের 'পরে। অর্থাৎ যারা অমনিতেই আধমরা হ'য়ে র'য়েচে শিক্ষার ছুতো ক'রে তাদেরই মার বাড়িয়ে দেওয়া।

শিক্ষা-কর চাই বই কি, নইলে খরচ জোগাবে কিসে? কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্যে যে কর, কেন দেশের সবাই মিলে সে কর দেবে না? সিভিল সার্ভিস আছে, মিলিটারি সার্ভিস আছে, গভর্ণর, ভাইস্‌রয় ও তাঁদের সদস্যবর্গ আছেন কেন তাঁদের পরিপূর্ণ পকেটে হাত দেবার জো নেই? তাঁরা কি এই চাষীদের অন্নের ভাগ থেকেই বেতন নিয়ে ও পেন্সন নিয়ে অবশেষে দেশে গিয়ে ভোগ করেন না? পাটকলের যে-সব বড়ো বড়ো বিলাতী মহাজন পাটের চাষীর রক্ত দিয়ে মোটা মুনফার সৃষ্টি ক'রে দেশে রওনা করে, সেই মৃতপ্রায় চাষীদের শিক্ষা দেবার জন্যে তাদের কোনোই দায়িত্ব নেই? যে-সব মিনিষ্টার শিক্ষা-আইন পাস নিয়ে ভরাপেটে উৎসাহ প্রকাশ করেন তাঁদের উৎসাহের কানাকড়ি মূল্যও কি তাঁদের নিজের তহবিল থেকে দিতে হবে না?

এ'কেই বলে শিক্ষার জন্যে দরদ? আমি তো একজন জমিদার, আমার প্রজাদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে কিছু দিয়েও থাকি—আরও দ্বিগুণ তিনগুণ যদি দিতে হয় তো তাও দিতে রাজি আছি, কিন্তু এই কথাটা প্রতিদিন তাদের বুঝিয়ে দেওয়া দরকার হবে যে আমি তাদের আপন লোক, তাদের শিক্ষায় আমারই মঙ্গল, এবং আমিই তাদের দিচ্চি, দিচ্চে না এই রাজ্যশাসকদের সর্ব্বোচ্চ থেকে সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর একজনও এক পয়সাও।

সোভিয়েট রাশিয়ায় জনসাধারণের উন্নতিবিধানের চাপ খুবই বেশি, সে-জন্যে আহারে বিহারে লোকে কষ্ট পাচ্চে কম নয়, কিন্তু এই কষ্টের ভাগ উপর থেকে নীচে পর্য্যন্ত সকলেই নিয়েচে। তেমন কষ্টকে তো কষ্ট ব'ল্‌বো না, সে-যে তপস্যা। প্রাথমিক শিক্ষার নামে কণামাত্র শিক্ষা চালিয়ে ভারত-গবর্মেণ্ট এতদিন পরে দুশো বছরের কলঙ্ক মোচন ক'র্‌তে চান, অথচ তা'র দাম দেবে তা'রাই যারা দাম দিতে সকলের চেয়ে অক্ষম, গবর্মেণ্টের প্রশ্রয়লালিত বহ্বাশী বাহন যারা তা'রা নয়, তা'রা আছে গৌরব ভোগ করার জন্যে!

আমি নিজের চোখে না দেখ্‌লে কোনোমতেই

বিশ্বাস ক'র্‌তে পার্‌তুম না, যে, অশিক্ষা ও অবমাননার নিম্নতম তল থেকে আজ কেবলমাত্র দশ বৎসরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে এরা শুধু ক খ গ ঘ শেখায় নি, মনুষ্যত্বে সম্মানিত ক'রেচে। শুধু নিজের জাতকে নয়, অন্য জাতের জন্যেও এদের সমান চেষ্টা। অথচ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের মানুষেরা এদের অধার্ম্মিক ব'লে নিন্দা করে। ধর্ম্ম কি কেবল পুঁথির মন্ত্রে, দেবতা কি কেবল মন্দিরের প্রাঙ্গণে? মানুষকে যারা কেবলি ফাঁকি দেয় দেবতা কি তাদের কোনোখানে আছে?

অনেক কথা বলবার আছে। এ-রকম তথ্য সংগ্রহ ক'রে লেখা আমার অভ্যস্ত নয়, কিন্তু না-লেখা আমার অন্যায় হবে ব'লে লিখ্‌তে ব'সেচি। রাশিয়ার শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে ক্রমে ক্রমে লিখ্‌বো ব'লে আমার সঙ্কল্প আছে। কতবার মনে হ'য়েচে আর কোথাও নয় রাশিয়ায় এসে একবার তোমাদের সব দেখে যাওয়া উচিত। ভারতবর্ষ থেকে অনেক চর সেখানে যায়, বিপ্লবপন্থীরাও আনাগোনা করে, কিন্তু আমার মনে হয় কিছুর জন্য নয়, কেবল শিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষা ক'র্‌তে যাওয়া আমাদের পক্ষে একান্ত দরকার।

যাক্‌, আমার নিজের খবর দিতে উৎসাহ পাইনে।

আমি যে আর্টিষ্ট এই অভিমান মনে প্রবল হবার আশঙ্কা আছে। কিন্তু এ-পর্য্যন্ত বাইরে খ্যাতি পেয়েচি, অন্তরে পৌঁছয় না। কেবলি মনে হয় দৈবগুণে পেয়েচি নিজগুণে নয়।

ভাসচি এখন মাঝ-সমুদ্রে। পারে গিয়ে কপালে কী আছে জানিনে। শরীর ক্লান্ত, মন অনিচ্ছুক। শূন্য ভিক্ষাপাত্রের মতো ভারী জিনিষ জগতে আর কিছুই নেই, সেটা জগন্নাথকে শেষ নিবেদন ক'রে দিয়ে কবে আমি ছুটি পাবো? ইতি ৫ই অক্টোবর ১৯৩০।

১০

D. "Bremen"

বিজ্ঞান-শিক্ষায় পুঁথির পড়ার সঙ্গে চোখের দেখার যোগ থাকা চাই, নইলে সে-শিক্ষার বারো আনা ফাঁকি হয়। শুধু বিজ্ঞান কেন, অধিকাংশ শিক্ষাতেই এ-কথা খাটে। রাশিয়াতে বিবিধ বিষয়ের ম্যুজিয়মের যোগে সেই শিক্ষার সহায়তা করা হ'য়েচে। এই ম্যুজিয়ম শুধু বড়ো বড়ো সহরে নয়, প্রদেশে প্রদেশে, সামান্য পল্লীগ্রামের লোকেরও আয়ত্তগোচরে।

চোখে দেখে শেখার আর একটা প্রণালী হ'চ্চে ভ্রমণ। তোমরা তো জানোই আমি অনেক দিন থেকেই ভ্রমণ-বিদ্যালয়ের সঙ্কল্প মনে বহন ক'রে এসেচি। ভারতবর্ষ এত বড়ো দেশ, সকল বিষয়েই তা'র এত বৈচিত্র্য বেশি যে, তাকে সম্পূর্ণ ক'রে উপলব্ধি করা হণ্টারের গেজেটিয়র প'ড়ে হ'তে পারে না। এক সময়ে পদব্রজে তীর্থভ্রমণ আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল—আমাদের তীর্থগুলিও ভারতবর্ষের সকল অংশে ছড়ানো। ভারতবর্ষকে যথাসম্ভব সমগ্রভাবে প্রত্যক্ষ অনুভব কর্‌বার এই ছিল উপায়। শুধুমাত্র শিক্ষাকে লক্ষ্য ক'রে পাঁচ বছর ধ'রে ছাত্রদের যদি সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরিয়ে নেওয়া যায় তাহ'লে তাদের শিক্ষা পাকা হয়।

মন যখন সচল থাকে সে তখন শিক্ষার বিষয়কে সহজে গ্রহণ ও পরিপাক ক'র্‌তে পারে। বাঁধা খোরাকের সঙ্গে সঙ্গেই ধেনুদের চ'রে খেতে দেওয়ারও দরকার হয়—তেমনি বাঁধা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই চ'রে শিক্ষা মনের পক্ষে অত্যাবশ্যক। অচল বিদ্যালয়ে বন্দী হ'য়ে অচল ক্লাসের পুঁথির খোরাকীতে মনের স্বাস্থ্য থাকে না। পুঁথির প্রয়োজন একেবারে

অস্বীকার করা যায় না——জ্ঞানের বিষয় মানুষের এত বেশি যে, ক্ষেত্রে গিয়ে তাদের আহরণ কর্‌বার উপায় নেই, ভাণ্ডার থেকেই তাদের বেশির ভাগ সংগ্রহ ক'র্‌তে হয়। কিন্তু পুঁথির বিদ্যালয়কে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যদি প্রকৃতির বিদ্যালয়ের মধ্যে দিয়ে ছাত্রদের বেড়িয়ে নিয়ে আসা যায় তাহ'লে কোনো অভাব থাকে না। এ-সম্বন্ধে অনেক কথা আমার মনে ছিল, আশা ছিল যদি সম্বল জোটে তবে কোনো এক সময়ে শিক্ষা-পরিব্রজন চালাতে পার্‌বো। কিন্তু আমার সময়ও নেই, সম্বলও জুট্‌বে না।

সোভিয়েট রাশিয়ায় দেখ্‌চি সর্ব্বসাধারণের জন্যে দেশভ্রমণের ব্যবস্থা ফলাও ক'রে তুল্‌চে। বৃহৎ এদের দেশ, বিচিত্র জাতীয় মানুষ তা'র অধিবাসী। জার্‌-শাসনের সময়ে এদের পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ জানাশোনা মেলামেশার সুযোগ ছিল না ব'ল্‌লেই হয়। বলা বাহুল্য তখন দেশ-ভ্রমণ ছিল সখের জিনিষ, ধনী লোকের পক্ষেই ছিল সম্ভব। সোভিয়েট আমলে সর্ব্বসাধারণের জন্যে তা'র উদ্যোগ। শ্রমক্লান্ত এবং রুগ্ন কর্ম্মিকদের শ্রান্তি এবং রোগ দূর কর্‌বার জন্যে প্রথম থেকেই সোভিয়েটরা দূরে নিকটে নানাস্থানে

স্বাস্থ্য-নিবাস স্থাপনের চেষ্টা ক'রেচে। আগেকার কালের বড়ো বড়ো প্রাসাদ তা'রা এই কাজে লাগিয়েচে। সে-সব জায়গায় গিয়ে বিশ্রাম এবং আরোগ্য লাভ যেমন একটা লক্ষ্য তেমনি শিক্ষালাভ আর একটা।

লোকহিতের প্রতি যাদের অনুরাগ আছে এই ভ্রমণ উপলক্ষ্যে তা'রা নানাস্থানে নানা লোকের আনুকূল্য করবার অবকাশ পায়। জনসাধারণকে দেশ-ভ্রমণে উৎসাহ দেওয়া এবং তা'র সুবিধা ক'রে দেওয়ার জন্যে পথের মাঝে মাঝে বিশেষ বিশেষ শিক্ষা বিতরণের উপযোগী প্রতিষ্ঠান খোলা হ'য়েচে, সেখানে পথিকদের আহার নিদ্রার ব্যবস্থা আছে, তা ছাড়া সকল রকম দরকারী বিষয়ে তা'রা পরামর্শ পেতে পারে। ককেশীয় প্রদেশ ভূতত্ত্ব আলোচনার উপযুক্ত স্থান। সেখানে এই রকম পান্থশিক্ষালয় থেকে ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ পাবার আয়োজন আছে। যে-সব প্রদেশ বিশেষভাবে নৃতত্ত্ব আলোচনার উপযোগী সে-সব জায়গায় পথিকদের জন্যে নৃতত্ত্ববিৎ উপদেশক তৈরি ক'রে নেওয়া হ'য়েচে।

গ্রীষ্মের সময় হাজার হাজার ভ্রমণেচ্ছু আপিসে নাম

সাহিত্যসভায় রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনা

রেজেষ্ট্রি করে। মে মাস থেকে আরম্ভ ক'রে দলে দলে নানা পথ বেয়ে প্রতিদিন যাত্রা চলে—এক একটি দলে পঁচিশ ত্রিশটি ক'রে যাত্রী। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে এই যাত্রীসঙ্ঘের সভ্য-সংখ্যা ছিল তিন হাজারের কাছাকাছি —২৯শে হ'য়েচে বারো হাজারের উপর।

এ-সম্বন্ধে য়ুরোপের অন্যত্র বা আমেরিকার সঙ্গে তুলনা করা সঙ্গত হবে না; সর্ব্বদাই মনে রাখা দরকার হবে, যে, রাশিয়ায় দশ বছর আগে শ্রমিকদের অবস্থা আমাদের মতোই ছিল—তা'রা শিক্ষা ক'র্‌বে, বিশ্রাম ক'র্‌বে বা আরোগ্য লাভ ক'র্‌বে সে জন্যে কারো কোনো খেয়াল ছিল না,—আজ এরা যে-সমস্ত সুবিধা সহজেই পাচ্চে তা আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের আশাতীত এবং ধনীদের পক্ষেও সহজ নয়। তা ছাড়া শিক্ষালাভের ধারা সমস্ত দেশ বেয়ে একসঙ্গে কত প্রণালীতেই প্রবাহিত তা আমাদের সিবিল সার্বিসে-পাওয়া দেশের লোকের পক্ষে ধারণা করাই কঠিন।

যেমন শিক্ষার ব্যবস্থা তেমনি স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা। স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে সোভিয়েট রাশিয়ায় যে-রকম বৈজ্ঞানিক অনুশীলন চ'ল্‌চে তা দেখে য়ুরোপ

আমেরিকার পণ্ডিতেরা প্রচুর প্রশংসা ক'র্‌চেন। শুধু মোটা বেতনের বিশেষজ্ঞদের দিয়ে পুঁথি সৃষ্টি করা নয়, সর্ব্বজনের মধ্যে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের প্রয়োগ যাতে পরিব্যাপ্ত হয়, এমন কি এ-দেশের চৌরঙ্গী থেকে যারা বহুদূরে থাকে তা'রাও যাতে অস্বাস্থ্যকর অবস্থার মধ্যে অযত্নে বা বিনা চিকিৎসায় মারা না যায় সে-দিকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি আছে।

বাংলা দেশে ঘরে ঘরে যক্ষ্মা রোগ ছড়িয়ে প'ড়্‌চে—রাশিয়া দেখে অবধি এ প্রশ্ন মন থেকে তাড়াতে পার্‌চি নে যে, বাংলা দেশের এই সব অল্পবিত্ত মুমূর্ষুদের জন্যে ক-টা আরোগ্যাশ্রম আছে? এ প্রশ্ন আমার মনে সম্প্রতি আরো জেগেচে এই জন্যে যে, খৃষ্টান ধর্ম্মযাজক ভারতশাসনে অসাধারণ ডিফিকল্টিজ্‌ নিয়ে আমেরিকার লোকের কাছে বিলাপ ক'র্‌চেন।

ডিফিকল্টিজ্‌ আছে বই কি। এক-দিকে সেই ডিফিকল্টিজের মূলে আছে ভারতীয়দের অশিক্ষা, অপর-দিকে ভারতশাসনের ভূরিব্যয়িতা। সে-জন্যে দোষ দেবো কাকে? রাশিয়ায় অন্নবস্ত্রের স্বচ্ছলতা আজও হয়নি, রাশিয়াও বহুবিস্তৃত দেশ, সেখানেও বহু বিচিত্র জাতির বাস, সেখানেও অজ্ঞান এবং স্বাস্থ্যতত্ত্ব

সম্বন্ধে অনাচার ছিল পর্ব্বতপ্রমাণ, কিন্তু শিক্ষাও বাধা পাচ্চে না, স্বাস্থ্যও না। সেইজন্যেই প্রশ্ন না ক'রে থাকা যায় না, ডিফিকল্টিজটা ঠিক কোন্‌খানে?

যারা খেটে খায় তা'রা সোভিয়েট স্বাস্থ্যনিবাসে বিনাব্যয়ে থাক্‌তে পারে, তা ছাড়া এই স্বাস্থ্যনিবাসের সঙ্গে সঙ্গে থাকে আরোগ্যালয় (sanatorium)। সেখানে শুধু চিকিৎসা নয়, পথ্য ও শুশ্রূষার উপযুক্ত ব্যবস্থা আছে। এই সমস্ত ব্যবস্থাই সর্ব্বসাধারণের জন্যে। সেই সর্ব্বসাধারণের মধ্যে এমন সব জাত আছে যারা য়ুরোপীয় নয় এবং য়ুরোপীয় আদর্শ অনুসারে যাদের অসভ্য বলা হ'য়ে থাকে।

এই রকম পিছিয়ে-পড়া জাত, যারা য়ুরোপীয় রাশিয়ার প্রাঙ্গণের ধারে বা বাইরে বাস করে তাদের শিক্ষার জন্য ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের বজেটে কত টাকা ধ'রে দেওয়া হ'য়েচে তা দেখ্‌লে শিক্ষার জন্যে কী উদার প্রয়াস তা বুঝ্‌তে পার্‌বে। য়ুক্রেনিয়ান রিপব্লিকের জন্যে ৪০ কোটি ৩০ লক্ষ, অতি-ককেশীয় রিপব্লিকের জন্য ১৩ কোটি ৪০ লক্ষ, উজ্‌বেকিস্তানের জন্য ৯ কোটি ৭০ লক্ষ, তুর্কমেনিস্তানের জন্য ২ কোটি ৯ লক্ষ রুব্‌ল্‌।

অনেক দেশে আরবী অক্ষরের চলন থাকাতে শিক্ষা-বিস্তারের বাধা হ'চ্ছিলো, সেখানে রোমক বর্ণমালা চালিয়ে দেওয়াতে শিক্ষার কাজ সহজ হ'য়েচে।

যে-বুলেটিন্ থেকে তথ্য সংগ্রহ ক'র্‌চি তারি দুটি অংশ তুলে দিই :—

Another of the most important tasks in the sphere of culture is undoubtedly the stabilization of local administrative institutions and the transfer of all local government and administrative work in the federative and autonomous republics to a language which is familiar to the toiling masses. This is by no means simple, and great efforts are still needed in this regard, owing to the low cultural level of the mass of the workers and peasants, and lack of sufficient skilled labour.

একটুখানি ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। সোভিয়েট সম্মিলনীর অন্তর্গত কতকগুলি রিপব্লিক ও স্বতন্ত্রশাসিত (autonomous) দেশ আছে। তা'রা প্রায়ই য়ুরোপীয়

নয়, এবং তাদের আচার ব্যবহার আধুনিক কালের সঙ্গে মেলে না। উদ্ধৃত অংশ থেকে বোঝা যাবে যে, সোভিয়েটদের মতে দেশের শাসনতন্ত্র দেশের লোকের শিক্ষারই একটা প্রধান উপায় ও অঙ্গ। আমাদের দেশের রাষ্ট্রচালনার ভাষা যদি দেশের লোকের আপন ভাষা হ'তো, তাহ'লে শাসনতন্ত্রের শিক্ষা তাদের পক্ষে সুগম হ'তো। ভাষা ইংরেজি হওয়াতে শাসননীতি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা সাধারণের আয়ত্তাতীত হ'য়েই রইলো। মধ্যস্থের যোগে কাজ চ'ল্‌চে, কিন্তু প্রত্যক্ষ যোগ রইলো না। আত্মরক্ষার জন্যে অস্ত্রচালনার শিক্ষা ও অভ্যাস থেকে যেমন জনসাধারণ বঞ্চিত, দেশ-শাসন নীতির জ্ঞান থেকেও তা'রা তেম্‌নি বঞ্চিত। রাষ্ট্র-শাসনের ভাষাও পরভাষা হওয়াতে পরাধীনতার নাগপাশের পাক আরও বেড়ে গেচে। রাজমন্ত্রসভায় ইংরেজি ভাষায় যে আলোচনা হ'য়ে থাকে তা'র সফলতা কতদূর আমি আনাড়ি তা বুঝিনে, কিন্তু তা'র থেকে প্রজাদের যে-শিক্ষা হ'তে পার্‌তো তা একটুও হ'লো না।

আর একটা অংশ :—

"Whenever questions of cultural-economic

construction in the national republics and districts come before the organs of the Soviet government, they are settled not on the line of guardianship, but on the lines of the maximum development of independence among the broad masses of workers and peasants and of initiative of the local Soviet organs".

যাদের কথা বলা হ'লো তা'রা হ'চ্চে পিছিয়ে-পড়া জাত। তাদের আগাগোড়া সমস্তই ডিফিকল্‌টিজ্‌ সরিয়ে দেবার জন্যে সোভিয়েট্‌রা দুশো বছর চুপচাপ ব'সে থাকবার বন্দোবস্ত করেনি। ইতিমধ্যে দশ বছর কাজ ক'রেচে। দেখে শুনে ভাব্‌চি, আমরা কি উজবেকদের চেয়ে, তুর্কমানীদের চেয়েও পিছিয়ে-পড়া জাত? আমাদের ডিফিকল্‌টিজের মাপ কি এদের চেয়েও বিশগুণ বেশি?

একটা কথা মনে প'ড়্‌লো। এদের এখানে খেলনার ম্যুজিয়ম আছে। এই খেলনা সংগ্রহের সঙ্কল্প বহুকাল থেকে আমার মনের মধ্যে ঘুরেচে। তোমাদের নন্দনালয়ে কলাভাণ্ডারে এই কাজ অবশেষে আরম্ভও

হ'লো। রাশিয়া থেকে কিছু খেলনা পেয়েচি। অনেকটা আমাদেরই মতো।

পিছিয়ে-পড়া জাতের সম্বন্ধে আরও কিছু জানাবার আছে। কাল লিখ্‌বো। পরশু সকাল পৌঁছবো নিয়ুইয়র্কে—তা'র পরে লেখ্‌বার যথেষ্ট অবসর পাবো কি না কে জানে। ইতি ৭ অক্টোবর, ১৯৩০।

১১

পিছিয়ে-পড়া জাতের শিক্ষার জন্যে সোভিয়েট রাশিয়ায় কী রকম উদ্যোগ চ'ল্‌চে সে-কথা তোমাকে লিখেচি। আজ দুই একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্‌।

উরাল পর্ব্বতের দক্ষিণে বাষ্‌কির্‌দের বাস। জার-এর আমলে সেখানকার সাধারণ প্রজার অবস্থা আমাদের দেশের মতোই ছিল। তা'রা চির-উপবাসের ধার দিয়েই চ'ল্‌তো। বেতনের হার ছিল অতি সামান্য, কোনো কারখানায় বড়ো রকমের কাজ কর্‌বার মতো শিক্ষা ছিল না, অবস্থাগতিকে তাদের ছিল নিতান্তই

মজুরের কাজ। বিপ্লবের পরে এই দেশের প্রজাদের স্বতন্ত্র শাসনের অধিকার দেবার চেষ্টা আরম্ভ হ'লো।

প্রথমে যাদের উপর ভার প'ড়েছিলো তা'রা আগেকার আমলের ধনী জোৎদার, ধর্ম্মযাজক এবং বর্ত্তমানে আমাদের ভাষায় যাদের ব'লে থাকি শিক্ষিত। সাধারণের পক্ষে সেটাতে সুবিধা হ'লো না। আবার এই সময়ে উৎপাত আরম্ভ ক'র্‌লে কল্‌চাকের সৈন্য। সে ছিল জার-আমলের পক্ষপাতী, তা'র পিছনে ছিল ক্ষমতাশালী বহিঃশত্রুদের উৎসাহ এবং আনুকূল্য। সোভিয়েটরা যদি-বা তাদের তাড়ালে, এলো ভীষণ দুর্ভিক্ষ। দেশে চাষবাসের ব্যবস্থা ছারখার হ'য়ে গেল।

১৯২২ খৃষ্টাব্দ থেকে সোভিয়েট আমলের কাজ ঠিক মতো সুরু হ'তে পেরেচে। তখন থেকে দেশে শিক্ষাদান এবং অর্থোৎপত্তির ব্যবস্থা প্রবলবেগে গ'ড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। এর আগে বাষ্‌কিরিয়াতে নিরক্ষরতা ছিল প্রায় সর্ব্বব্যাপী। এই কয় বছরের মধ্যে এখানে আটটি নর্ম্মাল স্কুল, পাঁচটি কৃষিবিদ্যালয়, একটি ডাক্তারি শিক্ষালয়, অর্থকরী বিদ্যা শেখবার জন্যে দুটি, কারখানার কাজে হাত পাকাবার জন্যে সতেরটি,

প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে ২৪৯৫টি এবং মধ্য প্রাথমিকের জন্যে ৮৭টি স্কুল সুরু হ'য়েচে। বর্ত্তমানে বাষ্কিরিয়াতে দুটি আছে সরকারী থিয়েটার, দুটি ম্যুজিয়ম, চৌদ্দটি পৌরগ্রন্থাগার, ১১২টি গ্রামের পাঠগৃহ (reading-room), ত্রিশটি সিনেমা শহরে এবং ৪৬টি গ্রামে, চাষীরা কোনো উপলক্ষ্যে শহরে এলে তাদের জন্যে বহুতর বাসা, ৮৯১টি খেলা ও আরামের জায়গা (recreation corners), তা ছাড়া হাজার হাজার কর্ম্মী ও চাষীদের ঘরে রেডিয়ো শ্রুতিযন্ত্র। বীরভূম জেলার লোক বাষ্কির্দের চেয়ে নিঃসন্দেহ স্বভাবত উন্নততর শ্রেণীর জীব। বাষ্কিরিয়ার সঙ্গে বীরভূমের শিক্ষা ও আরামের ব্যবস্থা মিলিয়ে দেখো। উভয় পক্ষের ডিফিকল্‌টিজেরও তুলনা করা কর্ত্তব্য হবে।

সোভিয়েট রাষ্ট্রসঙ্ঘের মধ্যে যতগুলি রিপাব্লিক হ'য়েচে তা'র মধ্যে তুর্কমেনিস্তান এবং উজ্‌বেকিস্তান সব চেয়ে অল্পদিনের। তাদের পত্তন হ'য়েচে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরে, অর্থাৎ বছর-ছয়েকের চেয়েও তাদের বয়স কম। তুর্কমেনিস্তানের জনসংখ্যা সবসুদ্ধ সাড়ে দশ লক্ষ। এদের মধ্যে নয় লক্ষ লোক চাষের

কাজ করে। কিন্তু নানা কারণে ক্ষেতের অবস্থা ভালো নয়, পশুপালনের সুযোগও তদ্রূপ।

এ-রকম দেশকে বাঁচাবার উপায় কারখানার কাজ খোলা, যাকে বলে industrialization। বিদেশী বা স্বদেশী ধনী মহাজনদের পকেট ভরাবার জন্যে কারখানার কথা হ'চ্চে না, এখানকার কারখানার উপস্বত্ব সর্ব্বসাধারণের। ইতিমধ্যেই একটা বড়ো সুতোর কল এবং রেশমের কল খোলা হ'য়েচে। আশকাবাদ শহরে একটা বৈদ্যুতজনন ষ্টেশন ব'সেচে, অন্যান্য শহরেও উদ্যোগ চ'ল্‌চে। যন্ত্রচালনক্ষম শ্রমিক চাই, তাই বহুসংখ্যক তুর্কমেনি যুবকদের মধ্য-রুশিয়ার বড়ো বড়ো কারখানায় শিক্ষার জন্যে পাঠানো হ'য়ে থাকে। আমাদের যুবকদের পক্ষে বিদেশীচালিত কারখানায় শিক্ষার সুযোগলাভ যে কত দুঃসাধ্য তা সকলেরই জানা আছে।

বুলেটিনে লিখ্‌চে, তুর্কমেনিস্তানে শিক্ষার ব্যবস্থা করা এত কঠিন যে, তা'র তুলনা বোধ হয় অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। বিরলবসতি জনসংস্থান দূরে দূরে, দেশে রাস্তার অভাব, জলের অভাব,

লোকালয়ের মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো মরুভূমি, লোকের আর্থিক দুরবস্থা অত্যন্ত বেশি।

আপাতত মাথা-পিছু পাঁচ রুব্‌ল্ ক'রে শিক্ষার খরচ প'ড়্‌চে। এ-দেশের প্রজাসংখ্যার সিকি পরিমাণ লোক যাযাবর (nomads)। তাদের জন্যে প্রাথমিক পাঠশালার সঙ্গে সঙ্গে বোর্ডিং স্কুল খোলা হ'য়েচে, ইঁদারার কাছাকাছি যেখানে বহুপরিবার মিলে আড্ডা করে সেই রকম জায়গায়। পড়ুয়াদের জন্যে খবরের কাগজও প্রকাশ করা হ'য়ে থাকে।

মস্কৌ শহরে নদীতীরে সাবেককালের একটি উদ্যানবেষ্টিত সুন্দর প্রাসাদে তুর্কমেনদের জন্যে শিক্ষক শিক্ষিত কর্‌বার একটি বিদ্যাভবন (Turcomen People's Home of Education) স্থাপিত হ'য়েচে। সেখানে সম্প্রতি একশো তুর্কমেন ছাত্র শিক্ষা পাচ্চে, বারো তেরো বছর তাদের বয়স। এই বিদ্যাভবনের ব্যবস্থা স্বায়ত্ত-শাসন-নীতি-অনুসারে। এই ব্যবস্থার মধ্যে কতকগুলি কর্ম্মবিভাগ আছে। যেমন স্বাস্থ্যবিভাগ, গার্হস্থ্যবিভাগ (household commission), ক্লাস কমিটি। স্বাস্থ্যবিভাগ থেকে দেখা হয়, সমস্ত মহলগুলি (compartments), ক্লাসগুলি, বাসের ঘর, আঙিনা

পরিষ্কার আছে কি-না। কোনো ছেলের যদি অসুখ করে, তা সে যতই সামান্য হোক, তা'র জন্যে ডাক্তার দেখাবার বন্দোবস্ত এই বিভাগের 'পরে। গার্হস্থ্য-বিভাগের অন্তর্গত অনেকগুলি উপবিভাগ আছে। এই বিভাগের কর্ত্তব্য হ'চ্চে দেখা—ছেলেরা পরিষ্কার পরিপাটি আছে কি-না। ক্লাসে পড়্‌বার কালে ছেলেদের ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি রাখা ক্লাস-কমিটির কাজ। প্রত্যেক বিভাগ থেকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হ'য়ে অধ্যক্ষ-সভা গ'ড়ে ওঠে। এই অধ্যক্ষ-সভার প্রতিনিধিরা স্কুল-কৌন্সিলে ভোট দেবার অধিকার পায়। ছেলেদের নিজেদের মধ্যে বা আর কারও সঙ্গে বিবাদ হ'লে অধ্যক্ষ-সভা তা'র তদন্ত করে; এই সভার বিচার স্বীকার ক'রে নিতে সব ছাত্রই বাধ্য।

এই বিদ্যাভবনের সঙ্গে একটি ক্লাব আছে। সেখানে অনেক সময়ে ছেলেরা নিজের ভাষায় নিজেরা নাট্যাভিনয় করে, গান বাজনার সঙ্গৎ হয়। ক্লাবের একটি সিনেমা আছে, তা'র থেকে মধ্য-এশিয়ার জীবন-যাত্রার চিত্রাবলী ছেলেরা দেখ্‌তে পায়। এ ছাড়া দেয়ালে-টাঙানো খবরের কাগজ বের করা হয়।

তুর্কমেনিস্তানের চাষের উন্নতির জন্যে সেখানে

বহুসংখ্যক কৃষিবিদ্যার ওস্তাদ পাঠানো হ'চ্চে। দুশোর বেশি আদর্শ-কৃষিক্ষেত্র খোলা হ'য়েচে। তা ছাড়া জল এবং জমি ব্যবহার সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করা হ'লো তা'তে কুড়ি হাজার দরিদ্রতম কৃষক-পরিবার কৃষির ক্ষেত, জল এবং কৃষির বাহন পেয়েচে।

এই বিরলপ্রজ দেশে ১৩০টা হাঁসপাতাল খোলা হ'য়েচে, ডাক্তারের সংখ্যা ছয়শো। বুলেটিনের লেখক সলজ্জ ভাষায় ব'ল্‌চেন,

"However, there is no occasion to rejoice in the fact, since there are 2,640 inhabitants to each hospital bed, and as regards doctors, Turcmenistan must be relegated to the last place in the Union. We can boast of some attainments in the field of modernization and the struggle against crass ignorance, though again we must warn the reader that Turcmenistan, being on a very low level of civilization, has preserved a good many customs of the distant past. However, the recent laws, passed in order

to combat the selling of women into marriage and child marriages, had produced the desired effect."

তুর্কমেনিস্তানের মতো মরুপ্রদেশে ছয় বৎসরের মধ্যে আপাতত ১৩০টা হাঁসপাতাল স্থাপন ক'রে এরা লজ্জা পায়—এমনতর লজ্জা দেখা আমাদের অভ্যাস নেই ব'লে বড়ো আশ্চর্য্য বোধ হ'লো। আমাদের বিস্তর ডিফিকল্‌টিজ দেখ্‌তে পেলুম, সেগুলো ন'ড়ে বস্‌বার কোনো লক্ষণ দেখায় না তাও দেখ্‌লুম, কিন্তু বিশেষ লজ্জা দেখ্‌তে পাইনে কেন ?

সত্যি কথা বলি, ইতিপূর্ব্বে আমারও মনে দেশের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে আশা করবার মতো সাহস চ'লে গিয়েছিলো। খৃষ্টান পাদ্রীর মতো আমিও ডিফিকল্‌টিজের হিসাব দেখে স্তম্ভিত হ'য়েচি—মনে মনে ব'লেচি, এত বিচিত্র জাতের মানুষ, এত বিচিত্র জাতের মূর্খতা, এত পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্ম, কী জানি কত কাল লাগ্‌বে আমাদের ক্লেশের বোঝা, আমাদের কলুষের আবর্জ্জনা নড়াতে।

সাইমন কমিশনের ফসল যে-আবহাওয়ায় ফ'লেচে, স্বদেশ সম্বন্ধে আমার প্রত্যাশার ভীরুতা সেই

আবহাওয়ারই। সোভিয়েট রাশিয়াতে এসে দেখ্‌লুম এখানকার উন্নতির ঘড়ি আমাদেরই মতো বন্ধ ছিল, অন্তত জনসাধারণের ঘরে—কিন্তু বহু শত বছরের অচল ঘড়িতেও আট দশ বছর দম লাগাতেই দিব্যি চ'ল্‌তে লেগেচে। এতদিন পরে বুঝ্‌তে পেরেচি আমাদের ঘড়িও চ'ল্‌তে পার্‌তো কিন্তু দম দেওয়া হ'লো না। ডিফিকল্‌টিজের মন্ত্র আওড়ানোতে এখন থেকে আর বিশ্বাস ক'র্‌তে পার্‌বো না।

এইবার বুলেটিন থেকে তুটি একটি অংশ উদ্ধৃত ক'রে চিঠি শেষ ক'র্‌বো :—

"The imperialist policy of the Czarist generals, after the conquest of Azerbaijan, consisted in converting the districts, inhabited by Mahommedans into colonies, destined to supply raw material to the central Russian markets."

মনে আছে অনেককাল হ'লো, পরলোকগত অক্ষয়-কুমার মৈত্রেয় একদা রেশম-গুটির চাষ প্রচলন সম্বন্ধে উৎসাহী ছিলেন। তাঁরই পরামর্শ নিয়ে আমিও রেশম-গুটির চাষ প্রবর্ত্তনের চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলুম।

তিনি আমাকে ব'লেছিলেন, রেশম-গুটির চাষে তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছ থেকে যথেষ্ট আনুকূল্য পেয়েছিলেন। কিন্তু যতবার এই গুটি থেকে সুতো ও সুতো থেকে কাপড় বোনা চাষীদের মধ্যে চল্‌তি কর্‌বার ইচ্ছা ক'রেচেন ততবারই ম্যাজিষ্ট্রেট দিয়েচেন বাধা।

"The agents of the Czar's Government were ruthlessly carrying out the principle of 'Divide and Rule' and did all in their power to sow hatred and discord between the various races. National animosities were fostered by the Government and Mahommedans and Armenians were systematically incited against each other. The ever-recurring conflicts between these two nations at times assumed the form of massacres."

হাঁসপাতালের সংখ্যাল্পতা নিয়ে বুলেটিন-লেখক লজ্জা স্বীকার ক'রেচেন বটে, কিন্তু একটা বিষয়ে গৌরব প্রকাশ না ক'রে থাক্‌তে পারেন নি :—

It is an undoubted fact, which even the worst enemies of the Soviets cannot deny :

চিত্রপ্রদর্শনীগৃহে রবীন্দ্রনাথের আগমন

for the last eight years the peace between the races of Azerbaijan has never been disturbed."

ভারতবর্ষের রাজত্বে লজ্জা প্রকাশের চলন নেই, গৌরব প্রকাশেরও রাস্তা দেখা যায় না।

এই লজ্জা স্বীকারের উপলক্ষ্যে একটা কথা পরিষ্কার ক'রে দেওয়া দরকার। বুলেটিনে আছে সমস্ত তুর্কমেনিস্থানে শিক্ষার জন্য জন-পিছু পাঁচ রুব্‌ল খরচ হ'য়ে থাকে। রুব্‌লের মূল্য আমাদের টাকার হিসাবে আড়াই টাকা। পাঁচ রুব্‌ল ব'ল্‌তে বোঝায় সাড়ে বারো টাকা। এই বাবদ কর আদায়ের কোনো একটা ব্যবস্থা হয়তো আছে, কিন্তু সেই কর আদায় উপলক্ষ্যে প্রজাদের নিজেদের মধ্যে আত্মবিরোধ ঘটিয়ে দেবার কোনো আশঙ্কা নিশ্চয় সৃষ্টি করা হয় নি। ইতি ৮ই অক্টোবর ১৯৩০।

১২

ব্রেমেন জাহাজ

তুর্কোমেনদের কথা পূর্ব্বেই ব'লেচি, মরুভূমিবাসী তা'রা, দশ লক্ষ মানুষ। এই চিঠি তা'রই পরিশিষ্ট।

সোভিয়েট গবমেণ্ট সেখানে কী কী বিদ্যায়তন স্থাপনের সঙ্কল্প ক'রেচে তা'র একটা ফর্দ্দ তুলে দিচ্চি।

Beginning with October 1st, 1930, the new budget year, a number of new scientific institutions and Institutes will be opened in Turcomenia, namely :

1. Turcomen Geological Committee ;

2. Turcomen Institute of Applied Botany ;

3. Institute for study and research of stock breeding ;

4. Institute of Hydrology and Geophysics

5. Institute for Economic Research ;

6. Chemico-Bacteriological Institute, and Institute of Social Hygiene.

The activity of all the scientific institutions of Turcomenia will be regulated by a special scientific management attached to the Council of People's Commissars of Turcomenia.

In connection with the removal of the Turcomen Government from Ashkhabad to Chardjni the construction of buildings for the following museums has been started :— Historical, Agricultural, Industrial and Trade Museum, Art Museum, Museums of the Revolution. In addition, the construction of an Observatory, State Library, House of published books and House of Science and Culture is planned.

The Department of Language and Literature of the Institute of the Turcomen Culture has completed the revision and translation into Russian of Turcomenian poetry including folk-lore material and old poetry texts.

Five itinerant cultural bases have been organized in Turcomenia. During the year 1930 two courses for training practical nurses and midwives were completed.

Altogether 46 persons were graduated. All graduates are sent to the village. ইতি ৮ই অক্টোবর, ১৯৩০।

১৩

সোভিয়েট রাশিয়ায় জনসাধারণকে শিক্ষা দেবার জন্যে কত বিবিধ রকমের উপায় অবলম্বন করা হ'য়েচে তা'র কিছু কিছু আভাস পূর্ব্বের চিঠিপত্র থেকে পেয়ে থাক্‌বে। আজ তোমাকে তারই মধ্যে একটা উদ্যোগের সংক্ষেপ বিবরণ লিখে পাঠাচ্চি।

কিছু দিন হ'লো মস্কৌ শহরে সাধারণের জন্যে একটি আরামবাগ খোলা হ'য়েচে। বুলেটিনে তা'র নাম দিয়েচে Moscow Park of Education and Recreation। তা'র মধ্যে প্রধান মণ্ডপটি প্রদর্শনীর জন্যে। সেখানে ইচ্ছা ক'র্‌লে খবর পাওয়া যায় সমস্ত প্রদেশে কারখানার শত সহস্র শ্রমিকদের জন্যে কত ডিস্পেন্সারি খোলা হ'য়েচে, মস্কৌ প্রদেশে স্কুলের সংখ্যা কত বাড়্‌লো; ম্যুনিসিপ্যাল বিভাগে দেখিয়েচে কত নতুন বাসাবাড়ি তৈরি হ'লো, কত নতুন বাগান,

শহরের কত বিষয়ে কত রকমের উন্নতি হ'য়েচে। নানা রকমের মডেল আছে, পুরানো পাড়াগাঁ, এবং আধুনিক পাড়াগাঁ, ফুল ও সবজি উৎপাদনের আদর্শ ক্ষেত, সোভিয়েট আমলে সোভিয়েট কারখানায় যে-সব যন্ত্র তৈরি হ'চ্চে তা'র নমুনা, হাল আমলের কো-অপারেটিভ ব্যবস্থায় কী রুটি তৈরি হ'চ্চে আর ওদের বিপ্লবের সময়েতেই বা কী-রকম হ'তো। তা ছাড়া নানা তামাসা নানা খেলার জায়গা, একটা নিত্য-মেলার মতো আর কি।

পার্কের মধ্যে একটা স্বতন্ত্র জায়গা কেবল ছোটো ছেলেদের জন্যে, সেখানে বয়স্ক লোকদের প্রবেশ নিষেধ, সেখানকার প্রবেশদ্বারে লেখা আছে ছেলেদের উৎপাত ক'রো না। এইখানে ছেলেদের যত রকম খেলনা, খেলা, ছেলেদের থিয়েটার, সে-থিয়েটারের ছেলেরাই চালক, ছেলেরাই অভিনেতা।

এই ছেলেদের বিভাগ থেকে কিছু দূরে আছে creche, বাংলায় তা'র নাম দেওয়া যেতে পারে শিশু-রক্ষণী। মা বাপ যখন পার্কে ঘুরে বেড়াতে প্রবৃত্ত তখন এই জায়গায় ধাত্রীদের জিম্মায় ছোটো শিশুদের রেখে যেতে পারে। একটা দোতলা মণ্ডপ (Pavillion)

আছে ক্লাবের জন্যে। উপরের তলায় লাইব্রেরি। কোথাও বা সতরঞ্চ খেলার ঘর, কোথাও আছে মানচিত্র আর দেওয়ালে-ঝোলানো খবরের কাগজ। তা ছাড়া সাধারণের জন্যে আহারের বেশ ভাল কো-অপারেটিভ দোকান আছে, সেখানে মদ বিক্রি বন্ধ। মস্কৌ পশুশালা বিভাগ থেকে এখানে একটা দোকান খুলেচে, এই দোকানে নানারকম পাখী মাছ চারাগাছ কিন্‌তে পাওয়া যায়। প্রাদেশিক শহরগুলিতেও এই রকমের পার্ক খোলবার প্রস্তাব আছে।

যেটা ভেবে দেখবার বিষয় সেটা হ'চ্চে এই, যে, জনসাধারণকে এরা ভদ্রসাধারণের উচ্ছিষ্টে মানুষ ক'র্‌তে চায় না। শিক্ষা, আরাম, জীবনযাত্রার সুযোগ সমস্তই এদের ষোলো আনা পরিমাণে। তা'র প্রধান কারণ জনসাধারণ ছাড়া এখানে আর কিছুই নেই। এরা সমাজগ্রন্থের পরিশিষ্ট অধ্যায় নয়—সকল অধ্যায়েই এরা।

আর একটা দৃষ্টান্ত তোমাকে দিই। মস্কৌ শহর থেকে কিছুদূরে সাবেক কালের একটি প্রাসাদ আছে। রাশিয়ার প্রাচীন অভিজাত বংশীয় কাউন্ট্‌ আপ্রাক্‌সিন-দের সেই ছিল বাসভবন। পাহাড়ের উপর থেকে

চারিদিকের দৃশ্য অতি সুন্দর দেখ্‌তে—শস্যক্ষেত্র নদী এবং পার্ব্বত্য অরণ্য। দুটি আছে সরোবর আর অনেকগুলি উৎস। থামওয়ালা বড়ো বড়ো প্রকোষ্ঠ, উঁচু বারান্দা, প্রাচীনকালের আসবাব ছবি ও পাথরের মূর্ত্তি দিয়ে সাজানো দরবারগৃহ, এ ছাড়া আছে সঙ্গীত-শালা, খেলার ঘর, লাইব্রেরি, নাট্যশালা; এ ছাড়া অনেকগুলি সুন্দর বহির্ভবন বাড়িটিকে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ঘিরে আছে।

এই বৃহৎ প্রাসাদে অল্‌গভো নাম দিয়ে একটি কো-অপারেটিভ স্বাস্থ্যাগার স্থাপন করা হ'য়েচে—এমন সমস্ত লোকদের জন্য যারা একদা এই প্রাসাদে দাসশ্রেণীতে গণ্য হ'তো। সোভিয়েট রাষ্ট্রসঙ্ঘে একটি কো-অপারেটিভ সোসাইটি আছে, শ্রমিকদের জন্যে বাসা নির্ম্মাণ যার প্রধান কর্ত্তব্য; সেই সোসাইটির নাম বিশ্রান্তি নিকেতন—The Home of Rest। এই অল্‌গভো তা'রই তত্ত্বাধীনে।

এমনতরো আরও চারটে সানাটোরিয়ম এর হাতে আছে। খাটুনির ঋতুকাল শেষ হ'য়ে গেলে অন্তত ত্রিশ হাজার শ্রমক্লান্ত এই পাঁচটি আরোগ্যশালায় এসে বিশ্রাম ক'র্‌তে পার্‌বে। প্রত্যেক লোক

এক পক্ষকাল এখানে থাক্‌তে পারে। আহারের ব্যবস্থা পর্য্যাপ্ত, আরামের ব্যবস্থা যথেষ্ট, ডাক্তারের ব্যবস্থাও আছে। কো-অপারেটিভ প্রণালীতে এই রকম বিশ্রান্তি-নিকেতন স্থাপনের উদ্যোগ ক্রমশই সাধারণের সম্মতি লাভ ক'র্‌চে।

আর কিছু নয়, শ্রমিকদের বিশ্রামের প্রয়োজন এমন ভাবে আর কোথাও কেউ চিন্তাও করেনি, আমাদের দেশের অবস্থাপন্ন লোকের পক্ষেও এ-রকম সুযোগ দুর্লভ।

শ্রমিকদের জন্যে এদের ব্যবস্থা কী-রকম সে তো শুনলে, এখন শিশুদের সম্বন্ধে এদের বিধান কী-রকম সে কথা বলি। শিশু জারজ কিম্বা বিবাহিত দম্পতির সন্তান সে সম্বন্ধে কোনো পার্থক্য এরা গণ্যই করে না। আইন এই যে, শিশু যে-পর্য্যন্ত না আঠারো বছর বয়সে সাবালক হয় সে পর্য্যন্ত তাদের পালনের ভার বাপমায়ের। বাড়িতে তাদের কী ভাবে পালন করা বা শিক্ষা দেওয়া হয় ষ্টেট সে সম্বন্ধে উদাসীন নয়। ষোলো বছর বয়সের পূর্ব্বে সন্তানকে কোথাও খাটুনির কাজে নিযুক্ত ক'র্‌তে পার্‌বে না। আঠারো বছর বয়স পর্য্যন্ত তাদের কাজের সময় পরিমাণ ছয় ঘণ্টা।

ছেলেদের প্রতি পিতামাতা আপন কর্ত্তব্য ক'র্‌চে কী না তা'র তদারকের ভার অভিভাবক বিভাগের 'পরে। এই বিভাগের কর্ম্মচারী মাঝে মাঝে পরিদর্শন ক'র্‌তে আসে, দেখে ছেলেদের স্বাস্থ্য কী-রকম আছে, পড়াশুনো কী-রকম চ'ল্‌চে। যদি দেখা যায় ছেলে-দের প্রতি অযত্ন হ'চ্চে, তাহ'লে বাপমায়ের হাত থেকে ছেলেদের ছাড়িয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু তবু ছেলেদের ভরণপোষণের দায়িত্ব থাকে বাপমায়েরই। এই রকম ছেলে-মেয়েদের মানুষ কর্‌বার ভার পড়ে সরকারী অভিভাবক বিভাগের।

ভাবখানা এই, সন্তানেরা কেবল তো বাপমায়ের নয়, মুখ্যত সমস্ত সমাজের। তাদের ভালোমন্দ নিয়ে সমস্ত সমাজের ভালোমন্দ। এরা যাতে মানুষ হ'য়ে ওঠে তা'র দায়িত্ব সমাজের, কেননা তা'র ফল সমা-জেরই। ভেবে দেখ্‌তে গেলে পরিবারের দায়িত্বের চেয়ে সমাজের দায়িত্ব বেশি বই কম নয়। জনসাধা-রণ সম্বন্ধেও এদের মনের ভাব ঐ রকমেরই। এদের মতে জনসাধারণের অস্তিত্ব প্রধানত বিশিষ্ট সাধারণেরই সুযোগ সুবিধার জন্যে নয়। তা'রা সমগ্র সমাজের অঙ্গ, সমাজের কোনো বিশেষ অঙ্গের প্রত্যঙ্গ নয়।

অতএব তাদের জন্য দায়িত্ব সমস্ত ষ্টেটের। ব্যক্তিগত ভাবে নিজের ভোগের বা প্রতাপের জন্য কেউ সমগ্র সমাজকে ডিঙিয়ে যেতে গেলে চ'ল্‌বে না।

যাই হোক্‌, মানুষের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত সীমা এরা যে ঠিক মতো ধ'র্‌তে পেরেচে তা আমার বোধ হয় না। সে হিসাবে এরা ফ্যাসিস্‌টদেরই মতো। এই কারণে সমষ্টির খাতিরে ব্যষ্টির প্রতি পীড়নে এরা কোনো বাধাই মান্‌তে চায় না। ভুলে যায় ব্যষ্টিকে দুর্ব্বল ক'রে সমষ্টিকে সবল করা যায় না, ব্যষ্টি যদি শৃঙ্খলিত হয় তবে সমষ্টি স্বাধীন হ'তে পারে না। এখানে জবরদস্ত লোকের একনায়কত্ব চ'ল্‌চে। এই রকম একের হাতে দশের চালনা দৈবাৎ কিছুদিনের মতো ভালো ফল দিতেও পারে, কিন্তু কখনই চিরদিন পারে না। উপযুক্ত মতো নায়ক পরম্পরাক্রমে পাওয়া কখনই সম্ভব নয়।

তা ছাড়া অবাধ ক্ষমতার লোভ মানুষের বুদ্ধিবিকার ঘটায়। একটা সুবিধার কথা এই যে, যদিও সোভিয়েট মূলনীতি সম্বন্ধে এরা মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে অতি নির্দ্দয়ভাবে পীড়ন ক'র্‌তে কুণ্ঠিত হয়নি তথাপি সাধারণভাবে শিক্ষার দ্বারা চর্চ্চার দ্বারা ব্যক্তির

আত্মনিহিত শক্তিকে বাড়িয়েই চ'লেচে—ফ্যাসিস্‌টদের মতো নিয়তই তাকে পেষণ করেনি। শিক্ষাকে আপন বিশেষ মতের একান্ত অনুবর্ত্তী ক'রে কতকটা গায়ের জোরে কতকটা মোহমন্ত্রের জোরে একঝোঁকা ক'রে তুলেচে তবুও সাধারণের বুদ্ধির চর্চ্চা বন্ধ করেনি। যদিও সোভিয়েট-নীতি প্রচার সম্বন্ধে এরা যুক্তির জোরের উপরেও বাহুবলকে খাড়া ক'রে রেখেচে তবুও যুক্তিকে একেবারে ছাড়েনি এবং ধর্ম্মমূঢ়তা এবং সমাজপ্রথার অন্ধতা থেকে সাধারণের মনকে মুক্ত রাখ্‌বার জন্যে প্রবল চেষ্টা ক'রেচে।

মনকে একদিকে স্বাধীন ক'রে অন্যদিকে জুলুমের বশ করা সহজ নয়। ভয়ের প্রভাব কিছুদিন কাজ ক'র্‌বে, কিন্তু সেই ভীরুতাকে ধিক্কার দিয়ে শিক্ষিত মন একদিন আপন চিন্তাস্বাতন্ত্র্যের অধিকার জোরের সঙ্গে দাবি ক'র্‌বেই। মানুষকে এরা দেহের দিকে নিপীড়িত ক'রেচে, মনের দিকে নয়। যারা যথার্থই দৌরাত্ম্য ক'র্‌তে চায় তা'রা মানুষের মনকে মারে আগে—এরা মনের জীবনীশক্তি বাড়িয়ে তুল্‌চে। এইখানেই পরিত্রাণের রাস্তা র'য়ে গেল।

আজ আর ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে পৌঁছবো নিয়ুইয়র্কে।

তা'র পর আবার নতুন পালা। এ-রকম ক'রে সাত-ঘাটের জল খেয়ে বেড়াতে আর ভালো লাগে না। এবারে এ অঞ্চলে না আস্‌বার ইচ্ছায় মনে অনেক তর্ক উঠেছিলো কিন্তু লোভই শেষকালে জয়ী হ'লো। ইতি ৯ই অক্টোবর, ১৯৩০।

ল্যান্স্‌ডাউন

ইতিমধ্যে তুই একবার দক্ষিণ দরজার কাছ ঘেঁসে গিয়েচি। মলয় সমীরণের দক্ষিণ দ্বার নয়, যে-দ্বার দিয়ে প্রাণবায়ু বেরোবার পথ খোঁজে। ডাক্তার ব'ল্‌লে, নাড়ীর সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের মুহূর্ত্তকালের যে-বিরোধ ঘ'টেছিলো সেটা যে অল্পের উপর দিয়েই কেটে গেচে এটাকে অবৈজ্ঞানিক ভাষায় মিরাক্‌ল বলা যেতে পারে। যাই হোক, যমদূতের ইসারা পাওয়া গেচে, ডাক্তার ব'ল্‌চে এখন থেকে সাবধান হ'তে হবে। অর্থাৎ উঠে হেঁটে বেড়াতে গেলেই বুকের কাছটাতে বাণ এসে লাগ্‌বে—শুয়ে প'ড়্‌লেই লক্ষ্য এড়িয়ে যাবে। তাই ভালোমানুষের মতো আধ-শোওয়া অবস্থায় দিন

কাটাচ্চি। ডাক্তার বলে, এমন ক'রে বছর-দশেক নিরাপদে কাট্‌তে পারে, তার পরে দশম দশাকে কেউ ঠেকাতে পারে না। বিছানায় হেলান দিয়ে আছি, আমার লেখার লাইনও আমার দেহ-রেখার নকল ক'র্‌তে প্রবৃত্ত। রোসো, একটু উঠে বসি।

দেখ্‌লুম কিছু দুঃসংবাদ পাঠিয়েচো, শরীরের এ অবস্থায় প'ড়্‌তে ভয় করে, পাছে ঢেউয়ের ঘায়ে ভাঙন লাগে। বিষয়টা কী তা'র আভাস পূর্ব্বেই পেয়েছিলুম—বিস্তারিত বিবরণের ধাক্কা সহ্য করা আমার পক্ষে শক্ত। তাই আমি নিজে পড়িনি অমিয়কে প'ড়্‌তে দিয়েচি।

যে-বাঁধনে দেশকে জড়িয়েচে টান মেরে মেরে সেটা ছিঁড়্‌তে হয়। প্রত্যেক টানে চোখের তারা উল্‌টে যায়, কিন্তু এ ছাড়া বন্ধন-মুক্তির অন্য উপায় নেই। ব্রিটিশরাজ নিজের বাঁধন নিজের হাতেই ছিঁড়্‌চে, তাতে আমাদের তরফে বেদনা যথেষ্ট, কিন্তু তা'র তরফে লোকসান কম নয়। সকলের চেয়ে বড়ো লোকসান এই যে, ব্রিটিশরাজ আপন মান খুইয়েচে। ভীষণের দুর্বৃত্ততাকে আমরা ভয় করি, সেই ভয়ের মধ্যেও সম্মান আছে, কিন্তু কাপুরুষের

দুর্বৃত্ততাকে আমরা ঘৃণা করি। বৃটিশ সাম্রাজ্য আজ আমাদের ঘৃণার দ্বারা ধিক্কৃত। এই ঘৃণায় আমাদের জোর দেবে, এই ঘৃণার জোরেই আমরা জিত্‌বো।

সম্প্রতি রাশিয়া থেকে এসেচি—দেশের গৌরবের পথ যে কত দুর্গম তা অনেকটা স্পষ্ট ক'রে দেখ্‌লুম। যে-অসহ্য দুঃখ পেয়েচে সেখানকার সাধকেরা, পুলিসের মার তা'র তুলনায় পুষ্পবৃষ্টি। দেশের ছেলেদের ব'লো এখনও অনেক বাকি আছে—তা'র কিছুই বাদ যাবে না। অতএব তা'রা যেন এখনই ব'ল্‌তে সুরু না করে যে বড়ো লাগ্‌চে—সে কথা ব'ল্‌লেই লাঠিকে অর্ঘ্য দেওয়া হয়।

দেশে বিদেশে ভারতবর্ষ আজ গৌরব লাভ ক'রেচে কেবলমাত্র মারকে স্বীকার না ক'রে—দুঃখকে উপেক্ষা করবার সাধনা আমরা যেন কিছুতে না ছাড়ি। পশু-বল কেবলি চেষ্টা ক'র্‌চে আমাদের পশুকে জাগিয়ে তুল্‌তে, যদি সফল হ'তে পারে তবেই আমরা হার্‌বো। দুঃখ পাচ্চি সে-জন্যে আমরা দুঃখ ক'র্‌বো না। এই আমাদের প্রমাণ করবার অবকাশ এসেচে যে, আমরা মানুষ—পশুর নকল ক'র্‌তে গেলেই এই শুভযোগ নষ্ট হবে। শেষ পর্য্যন্ত আমাদের ব'ল্‌তে হবে, ভয়

করিনে। বাংলা দেশের মাঝে মাঝে ধৈর্য্য নষ্ট হয়, সেইটেই আমাদের দুর্ব্বলতা। আমরা যখন নখদন্ত মেল্‌তে যাই তখনই তা'র দ্বারা নখীদন্তীদের সেলাম করা হয়। উপেক্ষা করো, নকল ক'রো না; অশ্রু-বর্ষণ নৈব নৈব চ।

আমার সব চেয়ে দুঃখ এই, যৌবনের সম্বল নেই। আমি প'ড়ে আছি গতিহীন হ'য়ে পান্থশালায়—যারা পথে চ'ল্‌চে তাদের সঙ্গে চল্‌বার সময় চ'লে গেচে। ইতি ২৮শে অক্টোবর ১৯৩০।

উপসংহার

সোভিয়েট্ শাসনের প্রথম পরিচয় আমার মনকে বিশেষভাবে আকর্ষণ ক'রেচে সে কথা পূর্ব্বেই ব'লেচি। তা'র কয়েকটি বিশেষ কারণ আছে সেটা আলোচনার যোগ্য।

সেখানকার যে-ছবিটি আমার মনের মধ্যে মূর্ত্তি নিয়েচে তা'র পিছনে দুলচে ভারতবর্ষের দুর্গতির কালো রঙের পটভূমিকা। এই দুর্গতির মূলে যে ইতিহাস আছে তা'র থেকে একটি তত্ত্ব পাওয়া যায়, সেই তত্ত্বটিকে চিন্তা ক'রে দেখ্‌লে আলোচ্য প্রসঙ্গে আমার মনের ভাব বোঝা সহজ হবে।

ভারতবর্ষে মুসলমান-শাসন-বিস্তারের ভিতরকার মানসটি ছিল রাজমহিমালাভ। সেকালে সর্ব্বদাই রাজ্য নিয়ে যে হাত-চালাচালি হ'তো তা'র গোড়ায় ছিল এই ইচ্ছা। গ্রীসের সেকেন্দর শাহ ধূমকেতুর অনলোজ্জ্বল পুচ্ছের মতো তাঁর রণবাহিনী নিয়ে বিদেশের আকাশ ঝেঁটিয়ে বেড়িয়েছিলেন সে কেবল

পায়োনিয়র্স কম্যুনে রবীন্দ্রনাথ

তাঁর প্রতাপ প্রসারিত কর্‌বার জন্যে। রোমকদেরও ছিল সেই প্রবৃত্তি। ফিনীশীয়েরা নানা সমুদ্রের তীরে তীরে বাণিজ্য ক'রে ফিরেচে কিন্তু তা'রা রাজ্য নিয়ে কাড়াকাড়ি করেনি।

একদা য়ুরোপ হ'তে বণিকের পণ্যতরী যখন পূর্ব্ব মহাদেশের ঘাটে ঘাটে পাড়ি জমালে তখন থেকে পৃথিবীতে মানুষের ইতিহাসে এক নূতন পর্ব্ব ক্রমশ অভিব্যক্ত হ'য়ে উঠলো, ক্ষাত্রযুগ গেল চ'লে, বৈশ্যযুগ দেখা দিল। এই যুগে বণিকের দল বিদেশে এসে তাদের পণ্য হাটের খিড়কি মহলে রাজ্য জুড়ে দিতে লাগ্‌লো। প্রধানত তা'রা মুনফার অঙ্ক বাড়াতে চেয়েছিলো, বীরের সম্মান তাদের লক্ষ্য ছিল না। এই কাজে তা'রা নানা কুটিল পন্থা অবলম্বন ক'র্‌তে কুণ্ঠিত হয়নি, কারণ তা'রা চেয়েছিলো সিদ্ধি, কীর্ত্তি নয়।

এই সময় ভারতবর্ষ তা'র বিপুল ঐশ্বর্য্যের জন্য জগতে বিখ্যাত ছিল—তখনকার বিদেশী ঐতিহাসিকেরা সে কথা বারম্বার ঘোষণা ক'রে গেচেন। এমন কি স্বয়ং ক্লাইভ ব'লে গেচেন, যে, 'ভারতবর্ষের ধন-শালিতার কথা যখন চিন্তা ক'রে দেখি তখন অপহরণ-নৈপুণ্য নিজের সংযমে আমি নিজেই বিস্মিত হই।'

এই প্রভূত ধন, এ কখনও সহজে হয় না—ভারতবর্ষ এ ধন উৎপন্ন ক'রেছিলো। তখন বিদেশ থেকে যারা এসে এখানকার রাজাসনে ব'সেচে তা'রা এ ধন ভোগ ক'রেচে, কিন্তু নষ্ট করেনি। অর্থাৎ তা'রা ভোগী ছিল, কিন্তু বণিক ছিল না।

তা'র পর বাণিজ্যের পথ সুগম করার উপলক্ষ্যে বিদেশী বণিকেরা তাদের কারবারের গদিটার উপরে রাজতক্ত চড়িয়ে ব'স্‌লো। সময় ছিল অনুকূল। তখন মোগলরাজত্বে ভাঙন ধ'রেচে, মারাঠীরা, শিখেরা এই সাম্রাজ্যের গ্রন্থিগুলো শিথিল ক'র্‌তে প্রবৃত্ত, ইংরেজের হাতে সেটা ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে গেল ধ্বংসের পথে।

পূর্ব্বতন রাজগৌরবলোলুপেরা যখন এ-দেশে রাজত্ব ক'র্‌তো তখন এ দেশে অত্যাচার অবিচার অব্যবস্থা ছিল না এ-কথা বলা চলে না। কিন্তু তা'রা ছিল এ-দেশের অঙ্গীভূত। তাদের আঁচড়ে দেশের গায়ে যা ক্ষত হ'য়েছিলো তা ত্বকের উপরে; রক্তপাত অনেক হ'য়েচে, কিন্তু অস্থিবন্ধনীগুলোকে নড়িয়ে দেয়নি। ধন-উৎপাদনের বিচিত্র কাজ তখন অব্যাহত চ'লছিলো, এমন কি নবাব বাদশাহের কাছ থেকে সে-সমস্ত কাজ প্রশ্রয় পেয়েচে। তা যদি না হ'তো তাহ'লে এখানে

বিদেশী বণিকের ভিড় ঘটবার কোনো কারণ থাক্‌তো না,—মরুভূমিতে পঙ্গপালের ভিড় জ'ম্‌বে কেন?

তা'র পরে ভারতবর্ষে বাণিজ্য ও সাম্রাজ্যের অশুভ সঙ্গমকালে বণিক রাজা দেশের ধনকল্পতরুর শিকড়-গুলোকে কী ক'রে ছেদন ক'র্‌তে লাগলেন, সে-ইতিহাস শতবার-কথিত এবং অত্যন্ত শ্রুতিকটু। কিন্তু পুরাতন ব'লে সেটাকে বিস্মৃতির মুখ-ঠুলি চাপা দিয়ে রাখ্‌বার চেষ্টা চ'ল্‌বে না। এ-দেশের বর্ত্তমান দুর্ব্বহ দারিদ্র্যের উপক্রমণিকা সেইখানে। ভারতবর্ষের ধন-মহিমা ছিল, কিন্তু সেটা কোন্ বাহন-যোগে দ্বীপান্তরিত হ'য়েচে সে-কথা যদি ভুলি তবে পৃথিবীর আধুনিক ইতিহাসের একটা তত্ত্বকথা আমাদের এড়িয়ে যাবে। আধুনিক রাষ্ট্রনীতির প্রেরণাশক্তি বীর্য্যাভিমান নয়, সে হ'চ্চে ধনের লোভ, এই তত্ত্বটি মনে রাখা চাই। রাজগৌরবের সঙ্গে প্রজাদের একটা মানবিক সম্বন্ধ থাকে, কিন্তু ধনলোভের সঙ্গে তা থাক্‌তেই পারে না। ধন নির্ম্মম, নৈর্ব্যক্তিক। যে-মুরগী সোনার ডিম পাড়ে লোভ-যে কেবল তা'র ডিমগুলোকেই ঝুড়িতে তোলে তা নয়, মুরগীটাকে-সুদ্ধ সে জবাই করে।

বণিকরাজের লোভ ভারতের ধন উৎপাদনের

বিচিত্র শক্তিকেই পঙ্গু ক'রে দিয়েচে। বাকী র'য়েচে কেবল কৃষি, নইলে কাঁচা মালের জোগান বন্ধ হয় এবং বিদেশী পণ্যের হাটে মূল্য দেবার শক্তি একেবারে নষ্ট হ'য়ে যায়। ভারতবর্ষের সদ্যঃপাতী জীবিকা এই অতি ক্ষীণ বৃন্তের উপর নির্ভর ক'রে আছে।

এ কথা মেনে নেওয়া যাক তখনকার কালে যে-নৈপুণ্য ও যে-সকল উপায়ের যোগে হাতের কাজ চ'লতো ও শিল্পীরা খেয়ে প'রে বাঁচতো যন্ত্রের প্রতিযোগিতায় তা'রা স্বতই নিষ্ক্রিয় হ'য়ে প'ড়েচে। অতএব প্রজাদের বাঁচাবার জন্যে নিতান্তই প্রয়োজন ছিল সর্ব্বপ্রযত্নে তাদের যন্ত্রকুশল ক'রে তোলা। প্রাণের দায়ে বর্ত্তমানকালে সকল দেশেই এই উদ্যোগ প্রবল। জাপান অল্পকালের মধ্যে ধনের যন্ত্রবাহনকে আয়ত্ত ক'রে নিয়েচে, যদি-না সম্ভব হ'তো তাহ'লে যন্ত্রী য়ুরোপের ষড়যন্ত্রে সে ধনে-প্রাণে মারা যেতো। আমাদের ভাগ্যে সে সুযোগ ঘ'ট্‌লো না, কেননা লোভ ঈর্ষাপরায়ণ। এই প্রকাণ্ড লোভের আওতায় আমাদের ধনপ্রাণ মুষড়ে এলো, তৎপরিবর্ত্তে রাজা আমাদের সান্ত্বনা দিয়ে ব'ল্‌চেন এখনও ধনপ্রাণের যেটুকু বাকী সেটুকু রক্ষা কর্‌বার জন্যে আইন এবং

চৌকিদারের ব্যবস্থাভার রইলো আমার হাতে। এদিকে আমাদের অন্নবস্ত্র বিদ্যাবুদ্ধি বন্ধক রেখে কণ্ঠাগত প্রাণে আমরা চৌকিদারের উর্দ্দির খরচ জোগাচ্চি। এই যে সাংঘাতিক ঔদাসীন্য, এর মূলে আছে লোভ। সকল প্রকার জ্ঞানে ও কর্ম্মে যেখানে শক্তির উৎসব বা পীঠস্থান সেখান থেকে বহু নীচে দাঁড়িয়ে এতকাল আমরা হাঁ ক'রে উপরের দিকে তাকিয়ে আছি আর সেই ঊর্দ্ধলোক থেকে এই আশ্বাসবাণী শুনে আস্‌চি, তোমাদের শক্তি ক্ষয় যদি হয় ভয় কী, আমাদের শক্তি আছে, আমরা তোমাদের রক্ষা ক'র্‌বো।

যার সঙ্গে মানুষের লোভের সম্বন্ধ তা'র কাছ থেকে মানুষ প্রয়োজন উদ্ধার করে, কিন্তু কখনও তাকে সম্মান করে না। যাকে সম্মান করে না তা'র দাবিকে মানুষ যথাসম্ভব ছোটো ক'রে রাখে; অবশেষে সে এত সস্তা হ'য়ে পড়ে যে, তা'র অসামান্য অভাবেও সামান্য খরচ ক'র্‌তে গায়ে বাজে। আমাদের প্রাণ-রক্ষা ও মনুষ্যত্বের লজ্জারক্ষার জন্যে কতই কম বরাদ্দ সে কারও অগোচর নেই। অন্ন নেই, বিদ্যা নেই, বৈদ্য নেই, পানের জল পাওয়া যায় পাঁক ছেঁকে, কিন্তু চৌকিদারের অভাব নেই, আর আছে মোটা মাইনের

কর্ম্মচারী, তাদের মাইনে গাল্‌ফ ষ্ট্রীমের মতো সম্পূর্ণ চ'লে যায় ব্রিটিশ দ্বীপের শৈত্য নিবারণের জন্যে, তাদের পেন্সন জোগাই আমাদের অন্ত্যেষ্টি-সৎকার খরচের অংশ থেকে। এর একমাত্র কারণ লোভ অন্ধ, লোভ নিষ্ঠুর—ভারতবর্ষ ভারতেশ্বরদের লোভের সামগ্রী।

অথচ কঠিন বেদনার অবস্থাতেও এ-কথা আমি কখনও অস্বীকার করিনে, যে, ইংরেজের স্বভাবে ঔদার্য্য আছে, বিদেশীয় শাসন-কার্য্যে অন্য য়ুরোপীয়দের ব্যবহার ইংরেজের চেয়েও কৃপণ এবং নিষ্ঠুর। ইংরেজ জাতি ও তা'র শাসননীতি সম্বন্ধে বাক্যে ও আচরণে আমরা যে-বিরুদ্ধতা প্রকাশ ক'রে থাকি তা আর কোনো জাতের শাসন-কর্ত্তাদের সম্বন্ধে সম্ভবপর হ'তো না; যদি-বা হ'তো তবে তা'র দণ্ডনীতি আরও অনেক দুঃসহ হ'তো, স্বয়ং য়ুরোপে এমন কি আমেরিকাতেও তা'র প্রমাণের অভাব নেই। প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ-ঘোষণা কালেও রাজপুরুষদের কাছে পীড়িত হ'লে আমরা যখন সবিস্ময়ে নালিশ করি তখন প্রমাণ হয় যে ইংরেজ জাতির প্রতি আমাদের নিগূঢ় শ্রদ্ধা মার খেতে খেতেও ম'র্‌তে চায় না। আমাদের স্বদেশী রাজা বা

জমিদারের কাছে আমাদের প্রত্যাশা আরও অনেক কম।

ইংলণ্ডে থাকার সময় এটা লক্ষ্য ক'রে দেখেচি, ভারতবর্ষে দণ্ডবিধান ব্যাপারে গ্লানিজনক ঘটনা ইংরেজ খবরের কাগজে প্রায় কিছুই এসে পৌঁছতো না। তা'র একমাত্র কারণ এ নয়, পাছে য়ুরোপে বা আমেরিকায় নিন্দা রটে। বস্তুত কড়া ইংরেজ শাসনকর্ত্তা স্বজাতির শুভবুদ্ধিকেই ভয় করে, বেশ ক'রেচি, খুব ক'রেচি, দরকার ছিল জবরদস্তি কর্‌বার—এটা বুক ফুলিয়ে বলা ইংরেজদের পক্ষে সহজ নয়, তা'র কারণ ইংরেজের মধ্যে বড়ো মন আছে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আসল কথাগুলো ইংরেজ খুব কম জানে। নিজেদের উপর ধিক্কার দেবার কারণ চাপা থাকে। এ-কথাও সত্য, ভারতের নিমক দীর্ঘকাল যে খেয়েচে তা'র ইংরেজি যকৃৎ এবং হৃদয় কলুষিত হ'য়ে গেচে অথচ আমাদের ভাগ্যক্রমে তা'রাই হ'লো অথরিটি।

ভারতবর্ষে বর্ত্তমান বিপ্লব উপলক্ষ্যে দণ্ডচালনা সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষ ব'লেচেন তা'র পীড়ন ছিল ন্যূনতম মাত্রায়। এ-কথা মেনে নিতে আমরা অনিচ্ছুক, কিন্তু অতীত ও বর্ত্তমানের প্রচলিত শাসননীতির সঙ্গে তুলনা

ক'রে দেখ্‌লে কথাটাকে অত্যুক্তি ব'ল্‌তে পার্‌বো না। মার খেয়েচি, অন্যায় মারও যথেষ্ট খেয়েচি এবং সব চেয়ে কলঙ্কের কথা গুপ্ত মার, তা'রও অভাব ছিল না। এ-কথাও ব'ল্‌বো, অনেক স্থলেই যারা মার খেয়েচে মাহাত্ম্য তাদেরই, যারা মেরেচে তা'রা আপন মান খুইয়েচে। কিন্তু সাধারণ রাষ্ট্রশাসন-নীতির আদর্শে আমাদের মারের মাত্রা ন্যূনতম বই কি। বিশেষত আমাদের 'পরে ওদের নাড়ীর টান নেই, তা ছাড়া সমস্ত ভারতবর্ষকে জালিয়ানওয়ালাবাগ ক'রে তোলা এদের পক্ষে বাহুবলের দিক থেকে অসম্ভব ছিল না। আমেরিকার সমগ্র নিগ্রো জাতি যুক্ত-রাজ্যের সঙ্গে নিজেদের যোগ বিচ্ছিন্ন কর্‌বার জন্যে যদি স্পর্দ্ধা-পূর্ব্বক অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হ'তো তাহ'লে কী-রকম বীভৎসভাবে রক্তপ্লাবন ঘট্‌তো বর্ত্তমান শান্তির অবস্থাতেও তা অনুমান ক'রে নিতে অধিক কল্পনাশক্তির প্রয়োজন হয় না। তা ছাড়া ইটালি প্রভৃতি দেশে যা ঘ'টেচে তা নিয়ে আলোচনা করা বাহুল্য।

কিন্তু এতে সান্ত্বনা পাইনে। যে-মার লাঠির ডগায় সে-মার দু-দিন পরে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে, এমন কি, ক্রমে তা'র লজ্জা আসাও অসম্ভব নয়। কিন্তু যে-মার

সোভিয়েট ছাত্রদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ

অন্তরে অন্তরে সে তো কেবল কতকগুলো মানুষের মাথা ভেঙে তা'র পরে খেলাঘরের ব্রিজ্ পার্টির অন্তরালে অন্তর্ধান করে না। সমস্ত জাতকে সে-যে ভিতরে ভিতরে ফতুর ক'রে দিলে। শতাব্দীর পর শতাব্দী তা'র তো বিরাম নেই। ক্রোধের মার থামে, লোভের মারের অন্ত পাওয়া যায় না।

টাইম্‌স্-এর সাহিত্যিক ক্রোড়পত্রে দেখা গেল Mackee নামক এক লেখক ব'লেচেন যে, ভারতে দারিদ্র্যের root cause—মূল কারণ হ'চ্চে এ-দেশে নির্বিচার বিবাহের ফলে অতিপ্রজন। কথাটার ভিতরকার ভাবটা এই যে, বাহির থেকে যে শোষণ চ'ল্‌চে তা দুঃসহ হ'তো না যদি স্বল্প অন্ন নিয়ে স্বল্প লোকে হাঁড়ি চেঁচেপুঁছে খেতো। শুন্‌তে পাই, ইংলণ্ডে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯১১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শতকরা ৬৬ সংখ্যা হারে প্রজাবৃদ্ধি হ'য়েচে। ভারতবর্ষে পঞ্চাশ বৎসরের প্রজাবৃদ্ধির হার শতকরা ৩৩। তবে এক যাত্রায় পৃথক ফল হ'লো কেন? অতএব দেখা যাচ্চে root cause প্রজাবৃদ্ধি নয়, root cause অন্ন সংস্থানের অভাব। তা'রও root কোথায়?

দেশ যারা শাসন ক'র্‌চে, আর যে-প্রজারা শাসিত

হ'চ্চে তাদের ভাগ্য যদি এক কক্ষবর্ত্তী হয় তাহ'লে অন্তত অন্নের দিক থেকে নালিশের কথা থাকে না, অর্থাৎ সুভিক্ষে দুর্ভিক্ষে উভয়ের ভাগ প্রায় সমান হ'য়ে থাকে। কিন্তু যেখানে কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষের মাঝখানে মহালোভ ও মহাসমুদ্রের ব্যবধান সেখানে অমাবস্যার তরফে বিদ্যা স্বাস্থ্য সম্মান সম্পদের কৃপণতা ঘুচ্‌তে চায় না, অথচ নিশীথ রাত্রির চৌকিদারদের হাতে বৃষচক্ষু লণ্ঠনের আয়োজন বেড়ে চলে। এ-কথা হিসাব ক'রে দেখ্‌তে ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌সের খুব বেশি খিটিমিটির দরকার হয় না, যে, আজ একশো ষাট বৎসর ধ'রে ভারতের পক্ষে সর্ব্ববিষয়ে দারিদ্র্য ও ব্রিটেনের পক্ষে সর্ব্ববিষয়ে ঐশ্বর্য্য পিঠেপিঠি সংলগ্ন হ'য়ে আছে। এর যদি একটি সম্পূর্ণ ছবি আঁকতে চাই তবে বাংলা দেশে যে-চাষী পাট উৎপন্ন করে আর সুদূর ডাণ্ডিতে যারা তা'র মুনফা ভোগ করে উভয়ের জীবনযাত্রার দৃশ্য পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দেখ্‌তে হয়। উভয়ের মধ্যে যোগ আছে লোভের, বিচ্ছেদ আছে ভোগের, এই বিভাগ দেড়শো বছরে বাড়্‌লো বই ক'ম্‌লো না।

যান্ত্রিক উপায়ে অর্থলাভকে যখন থেকে বহুগুণীকৃত করা সম্ভবপর হ'লো তখন থেকে মধ্যযুগের শিভাল্‌রি

অর্থাৎ বীরধর্ম্ম বণিকধর্ম্মে দীক্ষিত হ'য়েচে। এই নিদারুণ বৈশ্যযুগের প্রথম সূচনা হ'লো সমুদ্রযানযোগে বিশ্বপৃথিবী আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে। বৈশ্যযুগের আদিম ভূমিকা দস্যুবৃত্তিতে। দাস-হরণ ও ধন-হরণের বীভৎসতায় ধরিত্রী সে-দিন কেঁদে উঠেছিলো। এই নিষ্ঠুর ব্যবসায় বিশেষভাবে চ'লেছিলো পর-দেশে। সেদিন মেক্সিকোতে স্পেন শুধু কেবল সেখানকার সোনার সঞ্চয় নয়, সেখানকার সমগ্র সভ্যতাটাকেও রক্ত দিয়ে মুছে দিয়েচে। সেই রক্ত-মেঘের ঝড় পশ্চিম থেকে ভিন্ন ভিন্ন দমকায় ভারতবর্ষে এসে প'ড়লো। তা'র ইতিহাস আলোচনা করা অনাবশ্যক। ধন-সম্পদের স্রোত পূর্ব্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে ফিরলো।

তা'র পর থেকে কুবেরের সিংহাসনে পাকা হ'লো পৃথিবীতে। বিজ্ঞান ঘোষণা ক'রে দিলে যন্ত্রের নিয়মই বিশ্বের নিয়ম, বাহ্য সিদ্ধিলাভের বাহিরে কোনো নিত্য সত্য নেই। প্রতিযোগিতার উগ্রতা সর্ব্বব্যাপী হ'য়ে উঠলো, দস্যুবৃত্তি ভদ্রবেশে পেলো সম্মান। লোভের প্রকাশ্য ও চোরা রাস্তা দিয়ে কারখানা ঘরে, খনিতে, বড়ো বড়ো আবাদে, ছদ্মনামধারী দাসবৃত্তি, মিথ্যাচার

ও নির্দ্দয়তা কী রকম হিংস্র হ'য়ে উঠেচে সে-সম্বন্ধে য়ুরোপীয় সাহিত্যে রোমহর্ষক বর্ণনা বিস্তর পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে যারা টাকা করে আর যারা টাকা জোগায় অনেক দিন ধ'রে তাদের মধ্যে হাতাহাতি বেধে গেচে! মানুষের সব চেয়ে বড়ো ধর্ম্ম সমাজধর্ম্ম, লোভ রিপু সব চেয়ে তা'র বড়ো হন্তারক। এই যুগে সেই রিপু মানুষের সমাজকে আলোড়িত ক'রে তা'র সম্বন্ধ-বন্ধনকে শিথিল ও বিচ্ছিন্ন ক'রে দিচ্চে।

এক দেশে এক জাতির মধ্যেই এই নির্ম্মম ধনার্জ্জন ব্যাপারে যে-বিভাগ সৃষ্টি ক'র্‌তে উদ্যত তাতে যত দুঃখই থাক তবু সেখানে সুযোগের ক্ষেত্র সকলেরই কাছে সমান খোলা থাকে, শক্তির বৈষম্য থাকতে পারে, কিন্তু অধিকারের বাধা থাকে না। ধনের জাঁতাকলে সেখানে আজ যে আছে পেষ্য-বিভাগে কাল সে-ই উঠ্‌তে পারে পেষণ-বিভাগে। শুধু তাই নয়, ধনীরা যে-ধন সঞ্চয় করে, নানা আকারে সমস্ত দেশের মধ্যে তা'র কিছু-না-কিছু ভাগ-বাঁটোয়ারা আপনিই হ'য়ে যায়। ব্যক্তিগত সম্পদ জাতীয় সম্পদের দায়িত্ব-ভার অনেক পরিমাণে না নিয়ে থাক্‌তে পারে না। লোক-শিক্ষা, লোকস্বাস্থ্য, লোকরঞ্জন, সাধারণের জন্যে নানা-

প্রকার হিতানুষ্ঠান—এ-সমস্তই প্রভূত ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। দেশের এই সমস্ত বিচিত্র দাবী ইচ্ছায় অনিচ্ছায় লক্ষ্যত অলক্ষ্যত ধনীরা মিটিয়ে থাকে।

কিন্তু ভারতের যে-ধনে বিদেশী বণিক বা রাজ-পুরুষেরা ধনী,তা'র ন্যূনতম উচ্ছিষ্টমাত্রই ভারতের ভাগে পড়ে। পাটের চাষীর শিক্ষার জন্যে, স্বাস্থ্যের জন্যে সুগভীর অভাবগুলো অনাবৃষ্টির নালা ডোবার মতো হাঁ ক'রে রইলো, বিদেশগামী মুনফা থেকে তা'র দিকে কিছুই ফিরলো না। যা গেল তা নিঃশেষে গেল। পাটের মুনফা সম্ভবপর কর্‌বার জন্যে গ্রামের জলাশয়-গুলি দূষিত হ'লো—এই অসহ্য জলকষ্ট নিবারণের উদ্দেশে বিদেশী মহাজনদের ভরা থলি থেকে এক পয়সা খ'স্‌লো না। যদি জলের ব্যবস্থা ক'র্‌তে হয় তবে তা'র সমস্ত ট্যাক্সের টান এই নিঃস্ব নিরন্নদের রক্তের উপরই পড়ে। সাধারণকে শিক্ষা দেবার জন্যে রাজকোষে টাকা নেই, কেন নেই? তা'র প্রধান কারণ, প্রভূত পরিমাণ টাকা ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণই ত্যাগ ক'রে চ'লে যায়—এ হ'লো লোভের টাকা, যাতে ক'রে আপন টাকা ষোলো আনাই পর হ'য়ে যায়, অর্থাৎ জল উবে যায় এ-পারের জলাশয়ে আর

মেঘ হ'য়ে তা'র বর্ষণ হ'তে থাকে ও-পারের দেশে। সে-দেশের হাঁসপাতালে, বিদ্যালয়ে এই হতভাগ্য অশিক্ষিত অসুস্থ মুমূর্ষু ভারতবর্ষ সুদীর্ঘকাল অপ্রত্যক্ষ-ভাবে রসদ জুগিয়ে আস্‌চে।

দেশের লোকের দৈহিক ও মানসিক অবস্থার চরম দুঃখ-দৃশ্য অনেককাল স্বচক্ষে দেখে আস্‌চি। দারিদ্র্যে মানুষ কেবল যে মরে তা নয়, নিজেকে অবজ্ঞার যোগ্য ক'রে তোলে। তাই স্যর জন সাইমন ব'ল্‌লেন যে, "In our view the most formidable of the evils from which India is suffering have their roots in social and economic customs of long-standing which can only be remedied by the action of the Indian people themselves."—এটা হ'লো অবজ্ঞার কথা। ভারতের প্রয়োজনকে তিনি যে-আদর্শ থেকে বিচার ক'র্‌চেন সেটা তাঁদের নিজেদের আদর্শ নয়। প্রচুর ধন-উৎপাদনের জন্যে যে অবারিত শিক্ষা যে সুযোগ যে স্বাধীনতা তাঁদের নিজেদের আছে, যে-সমস্ত সুবিধা থাকাতে তাঁদের জীবনযাত্রার আদর্শ জ্ঞানে কর্ম্মে ভোগে নানা দিক থেকে প্রভূত পরিমাণে পরিপুষ্ট

হ'তে পেরেচে, জীর্ণবস্ত্র শীর্ণতনু রোগক্লান্ত শিক্ষাবঞ্চিত ভারতের পক্ষে সে-আদর্শ কল্পনার মধ্যেই আনেন না,—আমরা কোনো মতে দিনযাপন ক'র্‌বো লোকবৃদ্ধি নিবারণ ক'রে এবং খরচপত্র কমিয়ে, আর আজ তাঁরা নিজের জীবিকার যে পরিস্ফীত আদর্শ বহন ক'র্‌চেন তাকে চিরদিন বহুল পরিমাণে সম্ভব ক'রে রাখবো আমাদের জীবিকা খর্ব্ব ক'রে। এর বেশি কিছু ভাব্‌বার নেই, অতএব রেমেডি-র দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমাদেরই হাতে, যারা রেমেডিকে দুঃসাধ্য ক'রে তুলেচে তাদের বিশেষ কিছু কর্‌বার নেই।

মানুষ এবং বিধাতার বিরুদ্ধে এই সমস্ত নালিশ ক্ষান্ত ক'রে রেখেই অন্তরের দিক থেকে আমাদের নির্জ্জীব পল্লীর মধ্যে প্রাণসঞ্চার কর্‌বার জন্যে আমার অতি ক্ষুদ্র শক্তিকে কিছুকাল প্রয়োগ ক'র্‌চি। এ-কাজে গবর্মেণ্টের আনুকূল্য আমি উপেক্ষা করিনি, এমন কি ইচ্ছা ক'রেচি। কিন্তু ফল পাইনি, তা'র কারণ দরদ নেই। দরদ থাকা সম্ভব নয়—আমাদের অক্ষমতা আমাদের সকল প্রকার দুর্দ্দশা আমাদের দাবীকে ক্ষীণ ক'রে দিয়েচে। দেশের কোনো যথার্থ কৃত্যকর্ম্মে গবর্মেণ্টের সঙ্গে আমাদের কর্ম্মীদের উপযুক্তমতো যোগ-

সাধন অসম্ভব ব'লেই অবশেষে স্থির ক'রেচি। অতএব চৌকিদারদের উর্দ্দির খরচ জুগিয়ে যে ক-টা কড়ি বাঁচে তাই দিয়ে যা সম্ভব তাই করা যাবে এই রইলো কথা।

রাজকীয় লোভ ও তৎপ্রসূত দুর্ব্বিষহ ঔদাসীন্যের চেহারাটা যখন মনের মধ্যে নৈরাশ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে ব'সেচে এমন সময়েই রাশিয়ায় গিয়েছিলুম। য়ুরোপের অন্যান্য দেশে ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর যথেষ্ট দেখেচি; সে এতই উত্তুঙ্গ যে, দরিদ্র দেশের ঈর্ষাও তা'র উচ্চ চূড়া পর্য্যন্ত পৌঁছতে পারে না। রাশিয়ায় সেই ভোগের সমারোহ একেবারেই নেই, বোধ করি সেই জন্যেই তা'র ভিতরকার একটা রূপ দেখা সহজ ছিল।

ভারতবর্ষ যার থেকে একেবারেই বঞ্চিত তা'রই আয়োজনকে সর্ব্বব্যাপী কর্‌বার প্রবল প্রয়াস এখানে দেখতে পেলেম। বলা বাহুল্য, আমি আমার বহুদিনের ক্ষুধিত দেখার ভিতর দিয়ে সমস্তটা দেখেচি। পশ্চিম মহাদেশের অন্য কোনো স্বাধিকার-সৌভাগ্যশালী দেশবাসীর চক্ষে দৃশ্যটা কী-রকম ঠেকে সে-কথা ঠিক-মতো বিচার করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। অতীতকালে ভারতবর্ষের কী পরিমাণ ধন ব্রিটিশ

দ্বীপে চালান গিয়েচে, এবং বর্ত্তমানে কী পরিমাণ অর্থ বর্ষে বর্ষে নানাপ্রণালী দিয়ে সেই দিকে চ'লে যাচ্চে তা'র অঙ্ক-সংখ্যা নিয়ে তর্ক ক'র্‌তে চাইনে। কিন্তু অতি স্পষ্টই দেখ্‌তে পাচ্চি, এবং অনেক ইংরেজ লেখকও তা স্বীকার করেন যে, আমাদের দেশের রক্তহীন দেহে মন চাপা প'ড়ে গেচে, জীবনে আনন্দ নেই, আমরা অন্তরে বাহিরে ম'র্‌চি ;—এবং তা'র root cause যে ভারতবাসীরই মর্ম্মগত অপরাধের সঙ্গে জড়িত, অর্থাৎ কোনো গবর্মেণ্টই এর প্রতিকার ক'র্‌তে নিরতিশয় অক্ষম এ অপবাদ আমরা একেবারেই স্বীকার ক'র্‌বো না।

এ-কথা চিরদিনই আমার মনে ছিল যে, ভারতের সঙ্গে যে পরদেশবাসী শাসনকর্ত্তার স্বার্থের সম্বন্ধ প্রবল এবং দরদের সম্বন্ধ নেই, সে গবর্মেণ্ট নিজের গরজেই প্রবল শক্তিতে বিধি ও ব্যবস্থা রক্ষা ক'র্‌তে উৎসাহ-পরায়ণ, কিন্তু যে-সকল ব্যাপারে গরজ একান্ত আমাদেরই, যেখানে আমাদের দেশকে সর্ব্বপ্রকারে বাঁচিয়ে তুল্‌তে হবে, ধনে মনে ও প্রাণে,—সেখানে যথোচিত পরিমাণে শক্তি প্রয়োগ ক'র্‌তে এ গবর্মেণ্ট উদাসীন। অর্থাৎ এ সম্বন্ধে নিজের দেশের প্রতি

শাসনকর্ত্তাদের যত সচেষ্টতা, যত বেদনাবোধ, আমাদের দেশের প্রতি তা'র কিয়দংশও সম্ভব হয় না। অথচ আমাদের ধনপ্রাণ তাদেরই হাতে, যে উপায়ে, যে উপাদানে আমরা বিনাশ থেকে রক্ষা পেতে পারি, সে আমাদের হাতে নেই।

এমন কি, এ-কথা যদি সত্য হয় যে, সমাজ-বিধি সম্বন্ধে মূঢ়তাবশতই আমরা ম'র্‌তে ব'সেচি তবে এই মূঢ়তা যে-শিক্ষা যে-উৎসাহ দ্বারা দূর হ'তে পারে সেও ঐ বিদেশী গবর্মেন্টরই রাজকোষে ও রাজ-মজ্জিতে। দেশ-ব্যাপী অশিক্ষাজনিত বিপদ দূর কর্‌বার উপায় কমিশনের পরামর্শমাত্র দ্বারা লাভ করা যায় না—সে-সম্বন্ধে গবর্মেন্টের তেমনি তৎপর হওয়া উচিত যেমন তৎপর ব্রিটিশ গবর্মেন্ট নিশ্চয়ই হ'তো যদি এই সমস্যা ব্রিটন দ্বীপের হ'তো। সাইমন কমিশনকে আমাদের প্রশ্ন এই যে, ভারতের অজ্ঞতা অশিক্ষার মধ্যেই এত বড়ো মৃত্যুশেল নিহিত হ'য়ে এতদিন রক্তপাত ক'র্‌চে এই কথাই যদি সত্য হয়, তবে আজ একশো ষাট বৎসরের ব্রিটিশ শাসনে তা'র কিছুমাত্র লাঘব হ'লো না কেন? কমিশন কি সাংখ্য-তথ্য যোগে দেখিয়েচেন পুলিসের ডাণ্ডা জোগাতে ব্রিটিশ-রাজ যে খরচ 'ক'রে

থাকেন তা'র তুলনায় দেশকে শিক্ষিত ক'র্তে এই সুদীর্ঘকাল কত খরচ করা হ'য়েচে ? দূরদেশবাসী ধনী শাসকের পক্ষে পুলিসের ডাণ্ডা অপরিহার্য্য, কিন্তু সেই লাঠির বশঙ্গত যাদের মাথার খুলি, তাদের শিক্ষার ব্যয়বিধান বহু শতাব্দী মুলতবী রাখ্লেও কাজ চ'লে যায়।

রাশিয়ায় পা বাড়িয়েই প্রথমেই চোখে প'ড়্লো সেখানকার যে চাষী ও শ্রমিক সম্প্রদায় আজ আট বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় জনসাধারণেরই মতো নিঃসহায় নিরন্ন নির্য্যাতিত নিরক্ষর ছিল, অনেক বিষয়ে যাদের দুঃখভার আমাদের চেয়ে বেশি বই কম ছিল না, অন্তত তাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার এ অল্প কয় বৎসরের মধ্যেই যে-উন্নতি লাভ ক'রেচে দেড়শো বছরেও আমাদের দেশে উচ্চশ্রেণীর মধ্যেও তা হয়নি। আমাদের দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ স্বদেশের শিক্ষা সম্বন্ধে যে দুরাশার ছবি মরীচিকার পটে আঁকতেও সাহস পায়নি এখানে তা'র প্রত্যক্ষ রূপ দেখলুম দিগন্ত থেকে দিগন্তে বিস্তৃত।

নিজেকে এ প্রশ্ন বার-বার জিজ্ঞাসা ক'রেচি—এত বড়ো আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্ভবপর হ'লো কী ক'রে ?

মনের মধ্যে এই উত্তর পেয়েচি যে লোভের বাধা কোনোখানে নেই। শিক্ষার দ্বারা সব মানুষই যথোচিত সক্ষম হ'য়ে উঠ্‌বে এ-কথা মনে ক'র্‌তে কোথাও খট্‌কা লাগচে না। দূর এশিয়ার তুর্কমেনিস্তানবাসী প্রজাদেরও পুরোপূরি শিক্ষা দিতে এদের মনে একটুও ভয় নেই, প্রত্যুত প্রবল আগ্রহ আছে। তুর্কমেনিস্তানের প্রথাগত মূঢ়তার মধ্যেই সেখানকার লোকের সমস্ত দুঃখের কারণ এই কথাটা রিপোর্টে নির্দ্দেশ ক'রে উদাসীন হ'য়ে ব'সে নেই।

কোচিন-চায়নায় শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে শুনেচি কোনো ফরাসী পাণ্ডিত্যব্যবসায়ী ব'লেচেন যে, ভারতবর্ষে ইংরেজরাজ দেশী লোককে শিক্ষা দিতে গিয়ে যে ভুল ক'রেচেন ফ্রান্স্ যেন সে ভুল না করেন। এ-কথা মান্‌তে হবে যে, ইংরেজের চরিত্রে এমন একটা মহত্ত্ব আছে যে-জন্যে বিদেশী শাসননীতিতে তাঁরা কিছু কিছু ভুলে ক'রে বসেন, শাসনের ঠাস-বুনানীতে কিছু কিছু খেই হারায়, নইলে আমাদের মুখ ফুট্‌তে হয়তো আরও এক আধ শতাব্দী দেরি হ'তো।

এ-কথা অস্বীকার কর্‌বার জো নেই যে, শিক্ষার অভাবে অশক্তি অটল হ'য়ে থাকে, অতএব অশিক্ষা

পুলিসের ডাণ্ডার চেয়ে কম বলবান নয়। বোধ হয় যেন লর্ড কার্জ্জন সে কথাটা কিছু কিছু অনুভব ক'রেছিলেন। শিক্ষাদান সম্বন্ধে ফরাসী পাণ্ডিত্যব্যবসায়ী স্বদেশের প্রয়োজনকে যে-আদর্শে বিচার ক'রে থাকেন, শাসিত দেশের প্রয়োজনকে সে-আদর্শে করেন না। তা'র একমাত্র কারণ লোভ। লোভের বাহন যারা, তাদের মনুষ্যত্বের বাস্তবতা লুব্ধের পক্ষে অস্পষ্ট, তাদের দাবীকে আমরা স্বভাবতই খর্ব্ব ক'রে থাকি। যাদের সঙ্গে ভারতের শাসনের সম্বন্ধ তাদের কাছে ভারতবর্ষ আজ দেড়শো বৎসর খর্ব্ব হ'য়ে আছে। এই জন্যেই তা'র মর্ম্মগত প্রয়োজনের 'পরে উপরওয়ালার ঔদাসীন্য ঘুচ্‌লো না। আমরা যে কী অন্ন খাই, কী জলে আমাদের পিপাসা মেটাতে হয়, কী সুগভীর অশিক্ষায় আমাদের চিত্ত তমসাবৃত তা আজ পর্য্যন্ত ভালো ক'রে তাদের চোখে প'ড়্‌লো না। কেননা, আমরাই তাদের প্রয়োজনের, এইটেই বড়ো কথা, আমাদেরও যে প্রাণগত প্রয়োজন আছে, এ-কথাটা জরুরি নয়। তা ছাড়া আমরা এত অকিঞ্চিৎকর হ'য়ে আছি যে, আমাদের প্রয়োজনকে সম্মান করাই সম্ভব হয় না।

ভারতের যে কঠিন সমস্যা, যাতে ক'রে আমরা

এত কাল ধ'রে ধনে প্রাণে মনে ম'রেচি এ সমস্যাটা পাশ্চাত্যে কোথাও নেই। সে সমস্যাটি এই যে ভারতের সমস্ত স্বত্ব দ্বিধাকৃত ও সেই সর্ব্বনেশে বিভাগের মূলে আছে লোভ। এই কারণে রাশিয়ায় এসে যখন সেই লোভকে তিরস্কৃত দেখ্‌লুম তখন সেটা আমাকে যত বড়ো আনন্দ দিলে এতটা হয়তো স্বভাবত অন্যকে না দিতে পারে। তবুও মূল কথাটা মন থেকে তাড়াতে পারিনে সে হ'চ্চে এই যে, আজ কেবল ভারতে নয়, সমস্ত পৃথিবীতেই যে-কোনো বড়ো বিপদের জাল-বিস্তার দেখা যাচ্চে তা'র প্রেরণা হ'চ্চে লোভ, সেই লোভের সঙ্গেই যত ভয়, যত সংশয়, সেই লোভের পিছনেই যত অস্ত্রসজ্জা, যত মিথ্যুক ও নিষ্ঠুর রাষ্ট্রনীতি।

আর একটা তর্কের বিষয় হ'চ্চে ডিক্‌টেটরশিপ্ অর্থাৎ রাষ্ট্র ব্যাপারে নায়কতন্ত্র নিয়ে। কোনো বিষয়েই নায়কিয়ানা আমি নিজে পছন্দ করিনে। ক্ষতি বা শাস্তির ভয়কে অগ্রবর্ত্তী ক'রে অথবা ভাষায় ভঙ্গীতে বা ব্যবহারে জিদ্ প্রকাশের দ্বারা নিজের মত প্রচারের রাস্তাটাকে সম্পূর্ণ সমতল করবার লেশমাত্র চেষ্টা আমি কোনো দিন নিজের কর্ম্মক্ষেত্রে

ক'র্‌তে পারিনে। সন্দেহ নেই যে একনায়কতার বিপদ আছে বিস্তর; তা'র ক্রিয়ায় একতানতা ও নিত্যতা অনিশ্চিত, যে চালক ও যারা চালিত তাদের মধ্যে ইচ্ছার অসম্পূর্ণ যোগসাধন হওয়াতে বিপ্লবের কারণ সর্ব্বদাই ঘটে, তা ছাড়া সবলে চালিত হওয়ার অভ্যাস চিত্তের ও চরিত্রের বলহানি করে; এর সফলতা যখন বাইরের দিকে ছুই চার ফসলে হঠাৎ আঁজলা ভ'রে তোলে, ভিতরের শিকড়কে দেয় মেরে।

জনগণের ভাগ্য যদি তাদের সাম্মিলিত ইচ্ছার দ্বারাই সৃষ্ট ও পালিত না হয় তবে সেটা হয় খাঁচা, দানাপানি সেখানে ভালো মিলতেও পারে, কিন্তু তাকে নীড় বলা চলে না, সেখানে থাক্‌তে থাক্‌তে পাখা যায় আড়ষ্ট হ'য়ে। এই নায়কতা শাস্ত্রের মধ্যেই থাক, গুরুর মধ্যেই থাক, আর রাষ্ট্রনেতার মধ্যেই থাক, মনুষ্যত্বহানির পক্ষে এমন উপদ্রব কিছুই নেই।

আমাদের সমাজে এই ক্লীবত্ব সৃষ্টি বহুযুগ থেকে ঘ'টে আস্‌চে এবং এর ফল প্রতিদিন দেখে আসচি। মহাত্মাজী যখন বিদেশী কাপড়কে অশুচি ব'লেছিলেন আমি তা'র প্রতিবাদ ক'রেছিলাম, আমি ব'লেছিলাম ওটা আর্থিক ক্ষতিকর হ'তে পারে, অশুচি হ'তেই পারে

না। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রচালিত অন্ধ চিত্ত ভোলাতে *হবে নইলে কাজ পাবো না, মনুষ্যত্বের এমনতর চিরস্থায়ী* অবমাননা আর কী হ'তে পারে? নায়কচালিত দেশ এমনি ভাবেই মোহাচ্ছন্ন হ'য়ে থাকে,—এক জাদুকর যখন বিদায় গ্রহণ করে, তখন আর এক জাদুকর আর-এক মন্ত্র সৃষ্টি করে।

ডিক্টেটরশিপ একটা সমস্ত আপদ, সে-কথা আমি মানি এবং সেই আপদের বহু অত্যাচার রাশিয়ায় আজ ঘ'ট্‌চে সে-কথাও আমি বিশ্বাস করি। এর নঙর্থক দিকটা জবরদস্তির দিক, সেটা পাপ। কিন্তু সদর্থক দিকটা দেখেছি, সেটা হ'লো শিক্ষা, জবরদস্তির একেবারে উল্টো।

দেশের সৌভাগ্য-সৃষ্টি-ব্যাপারে জনগণের চিত্ত সম্মিলিত হ'লে তবে সেটার ক্রিয়া সজীব ও স্থায়ী হয়; নিজের একনায়কত্বের প্রতি যারা লুব্ধ, নিজের চিত্ত ছাড়া অন্য সকল চিত্তকে অশিক্ষা দ্বারা আড়ষ্ট ক'রে রাখাই তাদের অভিপ্রায়-সিদ্ধির একমাত্র উপায়। জারের রাজত্বে শিক্ষার অভাবে জনগণ ছিল মোহাভিভূত, তা'র উপরে সর্ব্বব্যাপী একটা ধর্ম্মমূঢ়তা অজগর সাপের মতো সাধারণের চিত্তকে শত পাকে বেড়ে

ধ'রেছিলো। সেই মূঢ়তাকে সম্রাট অতি সহজে নিজের কাজে লাগাতে পার্‌তেন। তখন য়িহুদীর সঙ্গে খৃষ্টানের, মুসলমানের সঙ্গে আর্ম্মানির সকল প্রকার বীভৎস উৎপাত ধর্ম্মের নামে অনায়াসে ঘটানো যেতে পার্‌তো। তখন জ্ঞান ও ধর্ম্মের মোহদ্বারা আত্মশক্তিহারা শ্লথগ্রন্থি বিভক্ত দেশ বাহিরের শত্রুর কাছে সহজেই অভিভূত ছিল। একনায়কত্বের চিরাধিপত্যের পক্ষে এমন অনুকূল অবস্থা আর কিছুই হ'তে পারে না।

পূর্ব্বতন রাশিয়ার মতোই আমাদের দেশে এই অবস্থা বহুকাল থেকে বর্ত্তমান। আজ আমাদের দেশ মহাত্মাজীর চালনার কাছে বশ মেনেচে, কাল তিনি থাক্‌বেন না, তখন চালকত্বের প্রত্যাশীরা তেম্‌নি ক'রেই অকস্মাৎ দেখা দিতে থাক্‌বে যেমন ক'রে আমাদের দেশের ধর্ম্মাভিভূতদের কাছে নূতন নূতন অবতার ও গুরু যেখানে-সেখানে উঠে প'ড়্‌চে। চীন দেশে আজ নায়কত্ব নিয়ে জনকয়েক ক্ষমতালোভী জবরদস্তদের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন প্রলয় সংঘর্ষ চলেইচে, কারণ, জনসাধারণের মধ্যে সে-শিক্ষা নেই যাতে তা'রা নিজের সম্মিলিত ইচ্ছা দ্বারা দেশের ভাগ্য নিয়ামিত ক'র্‌তে পারে, তাই সেখানে আজ সমস্ত

দেশ ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে গেল। আমাদের দেশে সেই নায়ক-পদ নিয়ে দারুণ হানাহানি ঘ'টবে না এমন কথা মনে ক'রতে পারিনে—তখন দলিতবিদলিত হ'য়ে ম'রবে উলুখড়, জনসাধারণ, কারণ তা'রা উলুখড়, তা'রা বনস্পতি নয়।

রাশিয়াতেও সম্প্রতি নায়কের প্রবল শাসন দেখা গেল। কিন্তু এই শাসন নিজেকে চিরস্থায়ী করবার পন্থা নেয় নি, একদা সে-পন্থা নিয়েছিলো জারের রাজত্ব, অশিক্ষা ও ধর্ম্মমোহের দ্বারা জনসাধারণের মনকে অভিভূত ক'রে এবং কষাকের কষাঘাতে তাদের পৌরুষকে জীর্ণ ক'রে দিয়ে। বর্ত্তমান আমলে রাশিয়ায় শাসনদণ্ড নিশ্চল আছে ব'লে মনে করিনে, কিন্তু শিক্ষা-প্রচারের প্রবলতা অসাধারণ। তা'র কারণ এর মধ্যে ব্যক্তিগত বা দলগত ক্ষমতা-লিপ্সা বা অর্থলোভ নেই। একটা বিশেষ অর্থনৈতিক মতে সর্ব্বসাধারণকে দীক্ষিত ক'রে জাতি বর্ণ ও শ্রেণী নির্ব্বিশেষে সকলকেই মানুষ ক'রে তোলবার একটা দুর্নিবার ইচ্ছা আছে। তা যদি না হ'তো তাহ'লে ফরাসী পণ্ডিতের কথা মান্‌তে হ'তো যে, শিক্ষা দেওয়াটা একটা মস্ত ভুল।

অর্থনৈতিক মতটা সম্পূর্ণ গ্রাহ্য কী না সে-কথা

বল্‌বার সময় আজও আসেনি—কেননা এ মত এতদিন প্রধানত পুঁথির মধ্যেই টলে টলে বেড়াচ্ছিলো, এমন বৃহৎ ক্ষেত্রে এত বড়ো সাহসের সঙ্গে ছাড়া পায়নি। যে-প্রবল লোভের কাছে এই মত প্রথম থেকেই সাংঘাতিক বাধা পেতো সেই লোভকেই এরা সাংঘাতিকভাবে সরিয়ে দিয়েচে। পরীক্ষার ভিতর দিয়ে পরিবর্ত্তন ঘ'ট্‌তে ঘ'ট্‌তে এ মতের কতটুকু কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা আজ নিশ্চিত কেউ ব'ল্‌তে পারে না। কিন্তু এ কথাটা নিশ্চিত বলা যেতে পারে যে, রাশিয়ায় জনসাধারণ এতকাল পরে যে শিক্ষা নির্ব্বারিত ও প্রচুরভাবে পাচ্চে তাতে ক'রে তাদের মনুষ্যত্ব স্থায়িভাবে উৎকর্ষ এবং সম্মানলাভ ক'র্‌লো।

বর্ত্তমান রাশিয়ায় নিষ্ঠুর শাসনের জনশ্রুতি সর্ব্বদাই শোনা যায়—অসম্ভব না হ'তে পারে। নিষ্ঠুর শাসনের ধারা সেখানে চিরদিন চ'লে এসেচে, হঠাৎ তিরোভূত না হওয়াই সম্ভব। অথচ সেখানে চিত্রযোগে সিনেমাযোগে ইতিহাসের ব্যাখ্যায় সাবেক আমলের নিদারুণ শাসনবিধি ও অত্যাচারকে সোভিয়েট গবর্মেণ্ট অবিরত প্রত্যক্ষ করিয়ে দিচ্চে। এই গবর্মেণ্ট নিজেও যদি এই রকম নিষ্ঠুর পথ অবলম্বন ক'রে থাকে তবে

নিষ্ঠুরাচারের প্রতি এত প্রবল ক'রে ঘৃণা উৎপাদন ক'রে দেওয়াটাকে আর কিছু না হোক্ অদ্ভুত ভুল ব'ল্‌তে হবে। সিরাজউদ্দৌলা কর্ত্তৃক কালাগর্ত্তের নৃশংসতাকে যদি সিনেমা প্রভৃতি দ্বারা সর্ব্বত্র লাঞ্ছিত করা হ'তো তবে তা'র সঙ্গে সঙ্গেই জালিয়ানওয়ালা-বাগের কাণ্ড করাটাকে অন্তত মূর্খতা ব'ল্‌লে দোষ হ'তো না। কারণ এ-ক্ষেত্রে বিমুখ অস্ত্র অস্ত্রীকেই লাগ্‌বার কথা।

সোভিয়েট রাশিয়ায় মার্ক্‌সীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণের বিচারবুদ্ধিকে এক ছাঁচে ঢাল্‌বার একটা প্রবল প্রয়াস সুপ্রত্যক্ষ; সেই জেদের মুখে এ-সম্বন্ধে স্বাধীন আলোচনার পথ জোর ক'রে অবরুদ্ধ ক'রে দেওয়া হ'য়েচে। এই অপবাদকে আমি সত্য ব'লে বিশ্বাস করি। সেদিনকার য়ুরোপীয় যুদ্ধের সময় এই-রকম মুখ চাপা দেওয়া এবং গবর্মেণ্ট-নীতির বিরুদ্ধ-বাদীর মতস্বাতন্ত্র্যকে জেলখানায় বা ফাঁসিকাঠে বিলুপ্ত ক'রে দেওয়ার চেষ্টা দেখা গিয়েছিলো।

যেখানে আশু ফল-লাভের লোভ অতি প্রবল সেখানে রাষ্ট্রনায়কেরা মানুষের মত-স্বাতন্ত্র্যের অধি-কারকে মান্‌তে চায় না। তা'রা বলে ও-সব কথা পরে

হবে, আপাতত কাজ উদ্ধার ক'রে নিই। রাশিয়ার অবস্থা যুদ্ধকালের অবস্থা; অন্তরে বাহিরে শক্র। ওখানকার সমস্ত পরীক্ষাকে পণ্ড ক'রে দেবার জন্যে চারিদিকে নানা ছলবলের কাণ্ড চ'ল্‌চে। তাই ওদের নির্ম্মাণকার্য্যের ভিৎটা যত শীঘ্র পাকা করা চাই, এ-জন্যে বল-প্রয়োগ ক'র্‌তে ওদের কোনো দ্বিধা নেই। কিন্তু গরজ যত জরুরিই হোক্, বল জিনিষটা এক তরফা জিনিষ। ওটাতে ভাঙে, সৃষ্টি করে না। সৃষ্টিকার্য্যে দুই পক্ষ আছে, উপাদানকে স্বপক্ষে আনা চাই মারধোর ক'রে নয়, তা'র নিয়মকে স্বীকার ক'রে।

রাশিয়া যে-কাজে লেগেচে এ হ'চ্চে যুগান্তরের পথ বানানো; পুরাতন বিধি-বিশ্বাসের শিকড়গুলো তা'র সাবেক জমি থেকে উপড়ে দেওয়া; চিরাভ্যাসের আরামকে তিরস্কৃত করা। এ-রকম ভাঙনের উৎসাহে যে-আবর্ত্ত সৃষ্টি করে তা'র মাঝখানে প'ড়্‌লে মানুষ তা'র মাতুনির আর অন্ত পায় না,—স্পর্দ্ধা বেড়ে ওঠে; মানবপ্রকৃতিকে সাধনা ক'রে বশ কর্‌বার অপেক্ষা আছে এ-কথা ভুলে যায়, মনে করে তাকে তা'র আশ্রয় থেকে ছিঁড়ে নিয়ে একটা সীতাহরণ ব্যাপার ক'রে তাকে পাওয়া যেতে পারে। তা'র পরে লঙ্কায় আগুন

লাগে তো লাগুক। উপযুক্ত সময় নিয়ে স্বভাবের সঙ্গে রফা কর্‌বার তর সয় না যাদের, তা'রা উৎপাতকে বিশ্বাস করে, অবশেষে লাঠিয়ে পিটিয়ে রাতারাতি যা গ'ড়ে তোলে তা'র উপরে ভরসা রাখা চলে না, তা'র উপরে দীর্ঘকালের ভর সয় না।

যেখানে মানুষ তৈরি নেই, মত তৈরি হ'য়েচে, সেখানকার উচ্চণ্ড দণ্ডনায়কদের আমি বিশ্বাস করিনে। প্রথম কারণ, নিজের মত সম্বন্ধে আগেভাগে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা সুবুদ্ধি নয়, সেটাকে কাজে খাটাতে খাটাতে তবে তা'র পরিচয় হয়। ওদিকে ধর্ম্মতন্ত্রের বেলায় যে-জননায়কেরা শাস্ত্রবাক্য মানে না, তা'রাই দেখি অর্থতন্ত্রের দিকে শাস্ত্র মেনে অচল হ'য়ে ব'সে আছে। সেই শাস্ত্রের সঙ্গে যেমন ক'রে হোক্ মানুষকে টুঁটি চেপে, ঝুঁটি ধ'রে মেলাতে চায়,—এ কথাও বোঝে না জোর ক'রে ঠেসে-ঠুসে যদি কোনো এক রকমে মেলানো হয় তাতে সত্যের প্রমাণ হয় না, বস্তুত যে-পরিমাণেই জোর সেই পরিমাণেই সত্যের অপ্রমাণ।

য়ুরোপে যখন খৃষ্টান শাস্ত্রবাক্যে জবরদস্ত বিশ্বাস ছিল, তখন মানুষের হাড়গোড় ভেঙে তাকে পুড়িয়ে, বিঁধিয়ে, তাকে ঢিলিয়ে ধর্ম্মের সত্য-প্রমাণের চেষ্টা

দেখা গিয়েছিলো। আজ বল্‌শেভিক মতবাদ সম্বন্ধে তা'র বন্ধু ও শত্রু উভয় পক্ষেরই সেই রকম উদ্দাম গায়ের জোরী যুক্তি-প্রয়োগ। দুই পক্ষেরই পরস্পরের নামে নালিশ এই যে, মানুষের মত-স্বাতন্ত্র্যের অধিকারকে পীড়িত করা হ'চ্চে। মাঝের থেকে পশ্চিম মহাদেশে আজ মানবপ্রকৃতি দুই তরফ থেকেই ঠেলা খেয়ে ম'র্‌চে। আমার মনে প'ড়্‌চে আমাদের বাউলের গান—

নিঠুর গরজী

তুই কি মানসমুকুল ভাজবি আগুনে?
তুই ফুল ফুটাবি, বাস ছুটাবি সবুর বিহুনে।
দেখ্‌ না আমার পরমগুরু সাঁই,
সে যুগযুগান্তে ফুটায় মুকুল তাড়াহুড়া নাই।
তোর লোভ প্রচণ্ড, তাই ভরসা দণ্ড
এর আছে কোন্ উপায়?
কয় সে মদন, দিস্‌নে বেদন, শোন্ নিবেদন,
সেই শ্রীগুরুর মনে,
সহজধারা আপনহারা তাঁর বাণী শোনে,
রে গরজী॥

সোভিয়েট রাশিয়ার লোকশিক্ষা সম্বন্ধে আমার যা বক্তব্য সে আমি ব'লেচি, তা ছাড়া সেখানকার পলিটিক্‌স্ মুনফা-লোলুপদের লোভের দ্বারা কলুষিত নয় ব'লে রাশিয়ারাষ্ট্রের অন্তর্গত নানাবিধ প্রজা জাতি-বর্ণ নির্ব্বিশেষে সমান অধিকারের দ্বারা ও প্রকৃষ্ট শিক্ষার সুযোগে সম্মানিত হ'য়েচে এ কথাটারও আলোচনা ক'রেচি। আমি ব্রিটিশ ভারতের প্রজা ব'লেই এই দুটি ব্যাপার আমাকে এত গভীরভাবে আনন্দ দিয়েচে।

এখন বোধ করি, একটি শেষ প্রশ্নের উত্তর আমাকে দিতে হবে। বল্‌শেভিক্ অর্থনীতি সম্বন্ধে আমার মত কী, এ কথা অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রে থাকেন। আমার ভয় এই যে, আমরা চিরদিন শাস্ত্র-শাসিত পাণ্ডাচালিত দেশ, বিদেশের আমদানি বচনকে একেবারেই বেদবাক্য ব'লে মেনে নেবার দিকেই আমাদের মুগ্ধ মনের ঝোঁক। গুরুমন্ত্রের মোহ থেকে সাম্‌লিয়ে নিয়ে আমাদের বলা দরকার যে, প্রয়োগের দ্বারাই মতের বিচার হ'তে পাবে, এখনও পরীক্ষা শেষ হয়নি। যে-কোনো মতবাদ মানুষ সম্বন্ধীয় তা'র প্রধান অঙ্গ হ'চ্চে মানবপ্রকৃতি। এই মানবপ্রকৃতির
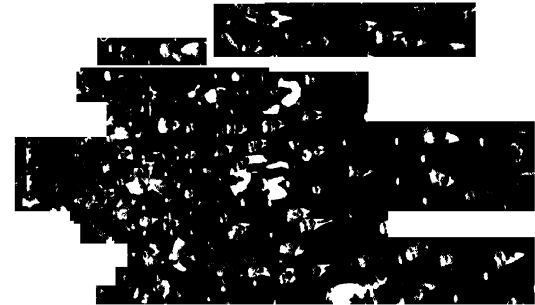
রবীন্দ্রনাথের কবি-সম্বর্দ্ধনা সভা

সঙ্গে তা'র সামঞ্জস্য কী পরিমাণে ঘ'ট্‌বে তা'র সিদ্ধান্ত হ'তে সময় লাগে। তত্ত্বটাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ কর্‌বার পূর্ব্বে অপেক্ষা ক'র্‌তে হবে। কিন্তু তবু সে সম্বন্ধে আলোচনা করা চলে, কেবলমাত্র লজিক নিয়ে বা অঙ্ক ক'ষে নয়,—মানবপ্রকৃতিকে সাম্‌নে রেখে।

মানুষের মধ্যে দুটো দিক আছে, একদিকে সে স্বতন্ত্র আর একদিকে সে সকলের সঙ্গে যুক্ত। এর একটাকে বাদ দিলে যেটা বাকি থাকে সেটা অবাস্তব। যখন কোনো একটা ঝোঁকে প'ড়ে মানুষ একদিকেই একান্ত উধাও হ'য়ে যায় এবং ওজন হারিয়ে নানাপ্রকার বিপদ ঘটাতে থাকে তখন পরামর্শদাতা এসে সঙ্কটটাকে সংক্ষেপ ক'রতে চান্, বলেন অন্য দিকটাকে একেবারেই ছেঁটে দাও। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যখন উৎকট স্বার্থপরতায় পৌঁছিয়ে সমাজে নানাপ্রকার উৎপাত মথিত করে, তখন উপদেষ্টা বলেন, স্বার্থ থেকে স্ব-টাকে এক কোপে দাও উড়িয়ে তাহ'লেই সমস্ত ঠিক চ'ল্‌বে। তাতে হয়তো উৎপাত ক'ম্‌তে পারে কিন্তু চলা বন্ধ হওয়া অসম্ভব নয়। লাগাম-ছেঁড়া ঘোড়া গাড়িটাকে খানায় ফেল্‌বার জো করে,—ঘোড়াটাকে গুলি ক'রে মার্‌লেই যে তা'র পর থেকে গাড়িটা সুস্থ ভাবে চ'ল্‌বে এমন

চিন্তা না ক'রে লাগামটা সম্বন্ধে চিন্তা কর্‌বার দরকার হ'য়ে ওঠে।

দেহে দেহে পৃথক ব'লেই মানুষ কাড়াকাড়ি হানাহানি ক'রে থাকে, কিন্তু সব মানুষকে এক দড়িতে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে সমস্ত পৃথিবীতে একটি মাত্র বিপুল কলেবর ঘটিয়ে তোলার প্রস্তাব বলগর্ব্বিত অর্থতাত্ত্বিক কোনো জার-এর মুখেই শোভা পায়। বিধাতার বিধিকে একেবারে সমূলে অতিদিষ্ট কর্‌বার চেষ্টায় যে-পরিমাণে সাহস তা'র চেয়ে অধিক পরিমাণে মূঢ়তা দরকার করে।

একদিন ভারতের সমাজটাই ছিল প্রধানত পল্লী-সমাজ। এই রকম ঘনিষ্ঠ পল্লীসমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে সমাজগত সম্পত্তির সামঞ্জস্য ছিল। লোকমতের প্রভাব ছিল এমন যে, ধনী আপনার ধন সম্পূর্ণ আপন ভোগে লাগাতে অগৌরব বোধ ক'র্‌তো। সমাজ তা'র কাছ থেকে আনুকূল্য স্বীকার ক'রেচে ব'লেই তাকে কৃতার্থ ক'রেচে—অর্থাৎ ইংরেজি ভাষায় যাকে চ্যারিটি বলে এর মধ্যে তা ছিল না। ধনীর স্থান ছিল সেখানেই যেখানে ছিল নির্ধন, সেই সমাজে আপন স্থান-মর্য্যাদা রক্ষা ক'র্‌তে গেলে ধনীকে

নানা পরোক্ষ আকারে বড়ো অঙ্কের খাজনা দিতে হ'তো। গ্রামে বিশুদ্ধ জল, বৈদ্য, পণ্ডিত, দেবালয়, যাত্রা, গান, কথা, পথঘাট সমস্তই রক্ষিত হ'তো গ্রামের ব্যক্তিগত অর্থের সমাজমুখীন প্রবাহ থেকে, রাজকর থেকে নয়। এর মধ্যে স্বেচ্ছা এবং সমাজের ইচ্ছা দু-ই মিলতে পেরেচে। যেহেতু এই আদানপ্রদান রাষ্ট্রীয় যন্ত্রযোগে নয়, পরন্তু মানুষের ইচ্ছাবাহিত, সেইজন্যে এর মধ্যে ধর্ম্মসাধনার ক্রিয়া চ'ল্‌তো, অর্থাৎ এতে কেবলমাত্র আইনের চালনায় বাহ্য ফল ফ'লতো না, অন্তরের দিকে ব্যক্তিগত উৎকর্ষ সাধন হ'তো। এই ব্যক্তিগত উৎকর্ষই মানবসমাজের স্থায়ী কল্যাণময় প্রাণবান আশ্রয়।

বণিক-সম্প্রদায়,—বিত্ত খাটিয়ে লাভ করাটাই যাদের মুখ্য ব্যবসায়,—তারা সমাজে ছিল পতিত যেহেতু তখন ধনের বিশেষ সম্মান ছিল না, এইজন্য ধন ও অধনের একটা মস্ত বিভেদ তখন ছিল অবর্ত্তমান। ধন আপন বৃহৎ সঞ্চয়ের দ্বারা নয়, আপন মহৎ দায়িত্ব পূরণ ক'রে তবে সমাজে মর্য্যাদা লাভ ক'র্‌তো, নইলে তা'র ছিল লজ্জা। অর্থাৎ সম্মান ছিল ধর্ম্মের, ধনের নয়। এই সম্মান সমর্পণ ক'রতে গিয়ে কারও আত্মসম্মানের হানি হ'তো না।

এখন সেদিন গেচে ব'লেই সামাজিক দায়িত্বহীন ধনের প্রতি একটা অসহিষ্ণুতার লক্ষণ নানা আকারে দেখা যাচ্চে। কারণ ধন এখন মানুষকে অর্ঘ্য দেয় না, তাকে অপমানিত করে।

য়ুরোপীয় সভ্যতা প্রথম থেকেই নগরে সংহত হবার পথ খুঁজেচে। নগরে মানুষের সুযোগ হয় বড়ো, সম্বন্ধ হয় খাটো। নগর অতি বৃহৎ, মানুষ সেখানে বিক্ষিপ্ত, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য একান্ত, প্রতিযোগিতার মথন প্রবল। ঐশ্বর্য্য সেখানে ধনী নির্ধনের বিভাগকে বাড়িয়ে তোলে এবং চ্যারিটির দ্বারা যেটুকু যোগসাধন হয় তাতে সান্ত্বনা নেই, সম্মান নেই। সেখানে যারা ধনের অধিকারী এবং যারা ধনের বাহন তাদের মধ্যে আর্থিক যোগ আছে, সামাজিক সম্বন্ধ বিকৃত অথবা বিচ্ছিন্ন।

এমন অবস্থায় যন্ত্রযুগ এলো, লাভের অঙ্ক বেড়ে চ'ল্‌লো অসম্ভব পরিমাণে। এই লাভের মহামারী সমস্ত পৃথিবীতে যখন ছড়াতে লাগ্‌লো তখন যারা দূরবাসী অনাত্মীয়, যারা নির্ধন, তাদের আর উপায় রইলো না, চীনকে খেতে হ'লো আফিম, ভারতকে উজাড় ক'র্‌তে হ'লো তা'র নিজস্ব, আফ্রিকা চিরদিন পীড়িত, তা'র পীড়া বেড়ে চ'ল্‌লো। এ তো গেল বাইরের কথা, পশ্চিম

মহাদেশের ভিতরেও ধনী নির্ধনের বিভাগ আজ অত্যন্ত কঠোর ; জীবনযাত্রার আদর্শ বহুমূল্য ও উপকরণবহুল হওয়াতে দুই পক্ষের ভেদ অত্যন্ত প্রবল হ'য়ে চোখে পড়ে। সাবেক কালে, অন্তত আমাদের দেশে, ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর ছিল প্রধানত সামাজিক দানে ও কর্ম্মে, এখন হ'য়েচে ব্যক্তিগত ভোগে। তাতে বিস্মিত করে, আনন্দিত করে না, ঈর্ষা জাগায়, প্রশংসা জাগায় না। সব চেয়ে বড়ো কথাটা হ'চ্চে এই যে, তখন সমাজে ধনের ব্যবহার একমাত্র দাতার স্বেচ্ছার উপর নির্ভর ক'র্‌তো না, তা'র উপরে ছিল সামাজিক ইচ্ছার প্রবল প্রভাব। সুতরাং দাতাকে নম্র হ'য়ে দান ক'র্‌তে হ'তো, শ্রদ্ধয়া দেয়ং, এই কথাটা খাট্‌তো।

মোট কথা হ'চ্চে আধুনিক কালে ব্যক্তিগত ধনসঞ্চয় ধনীকে যে প্রবল শক্তির অধিকার দিচ্চে তাতে সর্ব্বজনের সম্মান ও আনন্দ থাক্‌তে পারে না। তাতে এক পক্ষে অসীম লোভ, অপর পক্ষে গভীর ঈর্ষা, মাঝ-খানে দুস্তর পার্থক্য। সমাজে সহযোগিতার চেয়ে প্রতিযোগিতা অসম্ভব বড়ো হ'য়ে উঠ্‌লো। এই প্রতি-যোগিতা নিজের দেশের এক শ্রেণীর সঙ্গে অন্য শ্রেণীর, এবং বাহিরে এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের। তাই
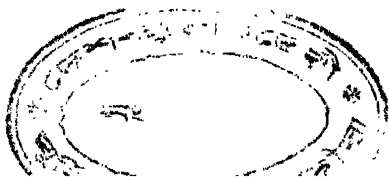
চারদিকে সংশয়হিংস্র অস্ত্র শাণিত হ'য়ে উঠ্‌চে, কোনো উপায়েই তা'র পরিমাণ কেউ খর্ব্ব ক'র্‌তে পার্‌চে না। আর পরদেশী যারা এই দূরস্থিত ভোগরাক্ষসের ক্ষুধা মেটাবার কাজে নিযুক্ত তাদের রক্তবিরল কৃশতা যুগের পর যুগে বেড়েই চ'লেচে। এই বহুবিস্তৃত কৃশতার মধ্যে পৃথিবীর অশান্তি বাসা বাঁধতে পারে না, এ-কথা যারা বলদর্পে কল্পনা করে তারা নিজের গোঁয়ার্ত্তুমির অন্ধতার দ্বারা বিড়ম্বিত। যারা নিরন্তর দুঃখ পেয়ে চ'লেচে সেই হতভাগারাই দুঃখ-বিধাতার প্রেরিত দূতদের প্রধান সহায়, তাদের উপবাসের মধ্যে প্রলয়ের আগুন সঞ্চিত হ'চ্চে।

বর্ত্তমান সভ্যতার এই অমানবিক অবস্থায় বল্‌শেভিক নীতির অভ্যুদয়। বায়ুমণ্ডলের এক অংশে তনুত্ব ঘ'ট্‌লে ঝড় যেমন বিদ্যুদ্দন্ত পেষণ ক'রে মারমূর্ত্তি ধ'রে ছুটে আসে এ-ও সেই রকম কাণ্ড। মানব সমাজে সামঞ্জস্য ভেঙে গেচে ব'লেই এই একটা অপ্রাকৃতিক বিপ্লবের প্রাদুর্ভাব। সমষ্টির প্রতি ব্যষ্টির উপেক্ষা ক্রমশই বেড়ে উঠ্‌ছিলো ব'লেই সমষ্টির দোহাই দিয়ে আজ ব্যষ্টিকে বলি দেবার আত্মঘাতী প্রস্তাব উঠেচে। তীরে অগ্নি-গিরি উৎপাত বাধিয়েচে ব'লে সমুদ্রকেই একমাত্র বন্ধু

ব'লে এই ঘোষণা। তীরহীন সমুদ্রের রীতিমতো পরিচয় যখন পাওয়া যাবে তখন কূলে ওঠবার জন্যে আবার আঁকুবাঁকু ক'র্‌তে হবে। সেই ব্যষ্টি-বর্জ্জিত সমষ্টির অবাস্তবতা কখনই মানুষ চিরদিন সইবে না। সমাজ থেকে লোভের দুর্গগুলোকে জয় ক'রে আয়ত্ত ক'র্‌তে হবে, কিন্তু ব্যক্তিকে বৈতরণী পার ক'রে দিয়ে সমাজ-রক্ষা ক'র্‌বে কে? অসম্ভব নয় যে, বর্ত্তমান রুগ্ন যুগে বল্‌শেভিক নীতিই চিকিৎসা, কিন্তু চিকিৎসা তো নিত্যকালের হ'তে পারে না, বস্তুত ডাক্তারের শাসন যেদিন ঘুচ্‌বে সেইদিনই রোগীর শুভদিন।

আমাদের দেশে আমাদের পল্লীতে পল্লীতে ধন-উৎপাদন ও পরিচালনার কাজে সমবায়-নীতির জয় হোক্ এই আমি কামনা করি। কারণ, এই নীতিতে যে-সহযোগিতা আছে, তাতে সহযোগীদের ইচ্ছাকে চিন্তাকে তিরস্কৃত করা হয় না ব'লে মানবপ্রকৃতিকে স্বীকার করা হয়। সেই প্রকৃতিকে বিরুদ্ধ ক'রে দিয়ে জোর খাটাতে গেলে সে জোর খাট্‌বে না।

এই সঙ্গে একটা কথা বিশেষ ক'রে বলা দরকার। আমি যখন ইচ্ছা করি, যে, আমাদের দেশে গ্রামগুলি বেঁচে উঠুক, তখন কখনও ইচ্ছে করিনে যে গ্রাম্যতা

ফিরে আসুক। গ্রাম্যতা হ'চ্চে সেই রকম সংস্কার, বিদ্যা, বুদ্ধি, বিশ্বাস ও কর্ম্ম যা গ্রাম-সীমার বাইরের সঙ্গে বিযুক্ত। বর্ত্তমান যুগের যে প্রকৃতি তা'র সঙ্গে যা কেবলমাত্র পৃথক নয়, যা বিরুদ্ধ। বর্ত্তমান যুগের বিদ্যা ও বুদ্ধির ভূমিকা বিশ্বব্যাপী—যদিও তা'র হৃদয়ের অনুবেদনা সম্পূর্ণ সে-পরিমাণে ব্যাপক হয়নি। গ্রামের মধ্যে সেই প্রাণ আনতে হবে যে-প্রাণের উপাদান তুচ্ছ ও সঙ্কীর্ণ নয়, যার দ্বারা মানবপ্রকৃতিকে কোনো-দিকে খর্ব্ব ও তিমিরাবৃত না রাখা হয়।

ইংলণ্ডে একদা কোনো এক গ্রামে একজন কৃষকের বাড়িতে ছিলুম। দেখলুম লণ্ডনে যাবার জন্যে ঘরের মেয়েগুলির মন চঞ্চল। শহরের সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যের তুলনায় গ্রামের সম্বলের এত দীনতা যে গ্রামের চিত্তকে স্বভাবতই সর্ব্বদা শহরের দিকে টান্‌চে। দেশের মাঝখানে থেকেও গ্রামগুলির যেন নির্ব্বাসন। রাশিয়ায় দেখেচি, গ্রামের সঙ্গে শহরের বৈপরীত্য ঘুচিয়ে দেবার চেষ্টা। এই চেষ্টা যদি ভালো ক'রে সিদ্ধ হয় তাহ'লে শহরের অস্বাভাবিক অতিবৃদ্ধি নিবারণ হবে। দেশের প্রাণশক্তি, চিন্তাশক্তি দেশের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হ'য়ে আপন কাজ ক'রতে পারবে।

মস্কৌ কলাভবনে রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনা।

আমাদের দেশের গ্রামগুলিও শহরের উচ্ছিষ্ট ও উদ্বৃত্তভোজী না হ'য়ে মনুষ্যত্বের পূর্ণ সম্মান ও সম্পদ ভোগ করুক এই আমি কামনা করি। একমাত্র সমবায় প্রণালীর দ্বারা গ্রাম আপন সর্ব্বাঙ্গীন শক্তিকে নিমজ্জন-দশা থেকে উদ্ধার ক'র্‌তে পার্‌বে এই আমার বিশ্বাস। আক্ষেপের বিষয় এই যে, আজ পর্য্যন্ত বাংলা দেশে সমবায় প্রণালী কেবল টাকা ধার দেওয়ার মধ্যেই ম্লান হ'য়ে আছে, মহাজনী গ্রাম্যতাকেই কিঞ্চিৎ শোধিত আকারে বহন ক'র্‌চে, সম্মিলিত চেষ্টায় জীবিকা উৎপাদন ও ভোগের কাজে সে লাগ্‌লো না।

তা'র প্রধান কারণ যে-শাসনতন্ত্রকে আশ্রয় ক'রে আমলা-বাহিনী সমবায়-নীতি আমাদের দেশে আবির্ভূত হ'লো সে-যন্ত্র অন্ধ বধির উদাসীন। তা ছাড়া হয়তো এ-কথা লজ্জার সঙ্গে স্বীকার ক'র্‌তে হবে যে, চরিত্রে যে গুণ থাক্‌লে সমবেত হওয়া সহজ হয় আমাদের সে গুণ নেই; যারা দুর্ব্বল, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস তাদের দুর্ব্বল। নিজের 'পরে অশ্রদ্ধাই অপরের প্রতি অশ্রদ্ধার ভিত্তি। যারা দীর্ঘকাল পরাধীন, আত্মসম্মান হারিয়ে তাদের এই দুর্গতি। প্রভুশ্রেণীর শাসন তা'রা নতশিরে স্বীকার ক'র্‌তে

পারে, কিন্তু স্বশ্রেণীর চালনা তা'রা সহ্য করে না, স্বশ্রেণীকে বঞ্চনা করা এবং তা'র প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করা তাদের পক্ষে সহজ।)

রুশীয় গল্পের বই প'ড়ে জানা যায় সেখানকার বহুকাল নির্য্যাতনপীড়িত কৃষকদেরও এই দশা। যতই দুঃসাধ্য হোক্ আর কোনো রাস্তা নেই, পরস্পরের শক্তিকে মনকে সম্মিলিত কর্‌বার উপলক্ষ্য সৃষ্টি ক'রে প্রকৃতিকে শোধন ক'রে নিতে হবে। সমবায় প্রণালীতে ঋণ দিয়ে নয়, একত্র কর্ম্ম করিয়ে পল্লীবাসীর চিত্তকে ঐক্যপ্রবণ ক'রে তুলে তবে আমরা পল্লীকে বাঁচাতে পার্‌বো।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট

১

গ্রামবাসীদিগের প্রতি *

বন্ধুগণ, আমি এক বৎসর প্রবাসে পশ্চিম মহাদেশের নানা জায়গায় ঘুরে আবার আমার আপন দেশে ফিরে এসেচি। একটি কথা তোমাদের কাছে বলা দরকার—অনেকেই হয়তো তোমরা অনুভব ক'র্‌তে পার্‌বে না কথাটি কতখানি সত্য। পশ্চিমের দেশ-বিদেশ হ'তে এত দুঃখ আজ প্রকাশ হ'য়ে প'ড়েচে ভিতর থেকে—এ-রকম চিত্র যে আমি দেখ্‌বো মনে করিনি। তা'রা সুখে নেই। সেখানে বিপুল পরিমাণে আসবাবপত্র, নানা রকম আয়োজন উপকরণের সৃষ্টি হ'য়েচে সন্দেহ নেই। কিন্তু গভীর অশান্তি তা'র এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে, সুগভীর একটা দুঃখ তাদের সর্ব্বত্র অধিকার ক'রে র'য়েচে।

* শ্রীনিকেতন বাৎসরিক উৎসবে সমবেত গ্রামবাসীগণের নিকট কথিত।

আমার নিজের দেশের উপর কোনো অভিমান আছে ব'লে এ-কথাটি ব'ল্‌চি মনে ক'রো না। বস্তুত য়ুরোপের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে। পশ্চিম মহাদেশে মানুষ যে-সাধনা ক'র্‌চে সে-সাধনার যে মূল্য তা আমি অন্তরের সঙ্গে স্বীকার করি। স্বীকার না করাকে অপরাধ ব'লে গণ্য করি। সে মানুষকে অনেক ঐশ্বর্য্য দিয়েচে, ঐশ্বর্য্যের পন্থা বিস্তৃত ক'রে দিয়েচে। সব হ'য়েচে। কিন্তু দুঃখ পাপে কলি এমন কোনো ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করে, তা প্রথমত চোখেই পড়ে না। ক্রমে ক্রমে তা'র ফল আমরা দেখ্‌তে পাই।

আমি সেখানকার অনেক চিন্তাশীল মনীষীর সঙ্গে আলাপ ক'রেচি। তাঁরা উদ্বিগ্ন হ'য়ে ভাব্‌তে ব'সেচেন—এত বিদ্যা এত জ্ঞান এত শক্তি এত সম্পদ কিন্তু কেন সুখ নেই, শান্তি নেই। প্রতি মুহূর্ত্তে সকলে শঙ্কিত হ'য়ে আছে কখন একটা ভীষণ উপদ্রব প্রলয়-কাণ্ড বাধিয়ে দেবে। তাঁরা কী স্থির ক'র্‌লেন ব'ল্‌তে পারি না। এখনও বোধ হয় ভালো ক'রে কোনো কারণ নির্ণয় ক'র্‌তে পারেন নি কিম্বা তাঁদের মধ্যে নানান্‌ লোক আপন আপন স্বভাব অনুসারে নানা

রকম কারণ কল্পনা ক'রেচেন। আমিও এ-সম্বন্ধে কিছু চিন্তা ক'রেচি। আমি যেটা মনে করি সেটা সম্পূর্ণ সত্য কি-না জানি না, কিন্তু আমার নিজের বিশ্বাস—এর কারণটি কোথায় তা আমি অনুভব ক'র্‌তে পেরেচি ঠিকমতো।

পশ্চিম দেশ যে-সম্পদ সৃষ্টি ক'রেচে সে অতি বিপুল প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন যন্ত্রের যোগে। ধনের বাহন হ'য়েচে যন্ত্র আবার সেই যন্ত্রের বাহন হ'য়েচে মানুষ। হাজার হাজার বহু শত সহস্র। তা'র পর যান্ত্রিক সম্পৎ-প্রতিষ্ঠার বেদীরূপে তা'রা বড়ো বড়ো শহর তৈরি ক'রেচে। সে-শহরের পেট ক্রমেই বেড়ে চ'লেচে, তা'র পরিধি অত্যন্ত বড়ো হ'য়ে উঠ্‌লো। নিউ-ইয়র্ক লণ্ডন প্রভৃতি শহর বহু গ্রাম উপগ্রামের প্রাণশক্তি গ্রাস ক'রে তবে একটা বৃহৎ দানবীয় রূপ ধারণ ক'রেচে। কিন্তু একটি কথা মনে রাখ্‌তে হবে—শহরে মানুষ কখনও ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধযুক্ত হ'তে পারে না। দূরে যাবার দরকার নেই, কলিকাতা শহর যেখানে আমরা থাকি, জানি, প্রতিবেশীর সঙ্গে সেখানে প্রতিবেশীর সুখে দুঃখে বিপদে আপদে কোনো সম্বন্ধ নেই। আমরা তাদের নাম পর্য্যন্ত জানিনে।

মানুষের একটি স্বাভাবিক ধর্ম্ম আছে, সে তা'র সমাজ-ধর্ম্ম। সমাজের মধ্যে সে যথার্থ আপনার আশ্রয় পায় পরস্পরের যোগে। পরস্পর সাহায্য করে ব'লে মানুষ যে-শক্তি পায় আমি তা'র কথা বলি না। মানুষের সম্বন্ধ যখন চারিদিকের প্রতিবেশীর মধ্যে, যখন আপন ঘরে এবং আপন ঘরের বাইরে ব্যাপ্ত হয় তখন সে-সম্বন্ধের বৃহত্ত্ব মানুষকে আপনি আনন্দ দেয়। আমাদের গভীর পরিতৃপ্তি সেখানে যেখানে কেবলমাত্র ব্যাবহারিক সম্বন্ধ নয়, সুযোগ সুবিধার সম্বন্ধ নয়, ব্যবসার সম্বন্ধ নয়, কিন্তু সকল রকম স্বার্থের অতীত আত্মীয় সম্বন্ধ। সেখানে মানুষ তার সমস্ত থেকে বঞ্চিত হ'তে পারে, কিন্তু মানব-আত্মার তৃপ্তি তা'র প্রচুর পরিমাণে হয়। বিদেশে আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা ক'রেচেন—যাকে ওঁরা happiness বলেন, আমরা বলি সুখ, এর আধার কোথায়?

মানুষ সুখী হয় সেখানেই যেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ সত্য হ'য়ে ওঠে—এ-কথাটি বলাই বাহুল্য। কিন্তু আজকের দিনে এটা বলার প্রয়োজন হ'য়েচে। কেননা, এই সম্বন্ধকে বাদ দিয়ে যেখানে ব্যবসা-ঘটিত যোগ সেখানে মানুষ এত প্রচুর ফললাভ

করে—বাইরের ফল—এত তাতে মুনফা হয়, এত রকম সুযোগ সুবিধা মানুষ পায় যে, মানুষের বল্‌বার সাহস থাকে না—এটাই সভ্যতার চরম বিকাশ নয়। এত পায়! এত তা'র শক্তি; যন্ত্রযোগে যে শক্তি প্রবল হ'য়ে ওঠে তা'র দ্বারা এমনি ক'রে সমস্ত পৃথিবীকে সে অভিভূত ক'রেচে, বিদেশের এত লোককে তা'র নিজের দাসত্বে ব্রতী ক'র্‌তে পেরেচে—তা'র এত অহঙ্কার। আর সেই সঙ্গে এমন অনেক সুযোগ সুবিধা আছে যা বস্তুত মানুষের জীবনযাত্রার পথে অত্যন্ত অনুকূল। সেগুলি ঐশ্বর্য্যযোগে উদ্ভূত হ'য়েচে। এগুলিকে চরম লাভ ব'লে মানুষ সহজেই মনে করে। না মনে ক'রে থাকতে পারে না। এর কাছে সে বিকিয়ে দিয়েচে মানুষের সকলের চেয়ে বড়ো জিনিষ, সে হ'লো মানব-সম্বন্ধ।

মানুষ বন্ধুকে চায়, যারা সুখে দুঃখে আমার আপন, যাদের কাছে ব'সে আলাপ ক'র্‌লে খুসি হই, যাদের বাপ-মার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ছিল যাদের আমার পিতৃস্থানীয় ব'লে জেনেচি, যাদের ছেলেরা আমার পুত্রসন্তানের স্থানীয়। এ-সব পরিমণ্ডলীর ভিতর মানুষ আপনার মানবত্বকে উপলব্ধি করে।

এ-কথা সত্য, একটা প্রকাণ্ড দানবীয় ঐশ্বর্য্যের মধ্যে মানুষ আপনার শক্তিকে অনুভব করে। সেও বহুমূল্য, আমি তাকে অবজ্ঞা ক'র্‌বো না। কিন্তু সেই শক্তি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যদি মানুষী সম্বন্ধ বিকাশের অনুকূল ক্ষেত্র কেবলই সঙ্কীর্ণ হ'তে থাকে তবে সেই শক্তি শক্তিশেল হ'য়ে উঠে মানুষকে মারে, মার্‌বার অস্ত্র তৈরি করে, মানুষের সর্ব্বনাশ কর্‌বার জন্য ষড়যন্ত্র করে, অনেক মিথ্যার সৃষ্টি করে, অনেক নিষ্ঠুরতাকে পালন করে, অনেক বিষবৃক্ষের বীজ রোপণ করে সমাজে। এ হ'তেই হবে। দরদ যখন চ'লে যায়, মানুষ অধিকাংশ মানুষকে যখন প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মতো দেখ্‌তে অভ্যস্ত হয়, লক্ষ লক্ষ মানুষকে যখন দেখে তা'রা আমার কলের চাকা চালিয়ে আমার কাপড় সস্তা ক'র্‌বে, আমার খাবার জুগিয়ে দেবে, আমার ভোগের উপকরণ সুগম ক'র্‌বে—এইভাবে যখন মানুষকে দেখ্‌তে অভ্যস্ত হয় তখন তা'রা মানুষকে দেখে না, মানুষের মধ্যে কলকে দেখে।

এখানে চালের কল আছে। সেই কল-দানবের চাকা সাঁওতাল ছেলেমেয়েরা। ধনী তাদের কি মানুষ মনে করে? তাদের সুখ-দুঃখের কি হিসেব আছে?

প্রতিদিনের পাওনা গুণে' দিয়ে তা'র কাছে ক'ষে রক্ত শুষে কাজ আদায় ক'রে নিচ্চে। এতে টাকা হয় সুখও হয়, অনেক হয় কিন্তু বিকিয়ে যায় মানুষের সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মানবত্ব। দয়া মায়া, পরস্পরের সহজ আনুকূল্য, দরদ—কিছু থাকে না। কে দেখে তাদের ঘরে কী হ'য়েচে না হ'য়েচে! এক সময় আমাদের গ্রামে উচ্চ নীচের ভেদ ছিল না তা নয়, প্রভু ছিল, দাস ছিল, পণ্ডিত ছিল, অজ্ঞান ছিল, ধনী ছিল, নির্ধন ছিল, কিন্তু সকলের সুখ-দুঃখের উপর সকলের দৃষ্টি ছিল। পরস্পর সম্মিলিত হ'য়ে একত্রীভূত একটা জীবনযাত্রা তা'রা তৈরি ক'রে তুলেছিলো। পূজা পার্ব্বণে আনন্দ উৎসবে—সকল সম্বন্ধে—প্রতিদিন তা'রা নানা রকমে মিলিত হ'য়েচে। চণ্ডীমণ্ডপে এসে গল্প ক'রেচে দাদাঠাকুরের সঙ্গে। যে অন্ত্যজ সেও একপাশে ব'সে আনন্দের অংশ গ্রহণ ক'রেচে। উপর নীচ জ্ঞানী অজ্ঞানের মাঝখানে যে রাস্তা যে সেতু সেটা খোলা ছিল।

আমি পল্লীর কথা ব'লচি, কিন্তু মনে রেখো—পল্লীই তখন সব, শহর তখন নগণ্য ব'লতে চাই না; কিন্তু গৌণ, মুখ্য নয়, প্রধান নয়। পল্লীতে পল্লীতে

কত পণ্ডিত কত ধনী কত মানী আপনার পল্লীকে জন্মস্থানকে আপনার ক'রে বাস ক'রেচে। সমস্ত জীবন হয়তো নবাবের ঘরে, দরবারে কাজ ক'রেচে। যা কিছু সম্পদ তা'রা পল্লীতে এনেচে। সেই অর্থে টোল চ'লেচে, পাঠশালা ব'সেচে, রাস্তাঘাট হ'য়েচে, অতিথিশালা, যাত্রা পূজা-অর্চ্চনায় গ্রামের মনপ্রাণ এক হ'য়ে মিলেচে। গ্রামে আমাদের দেশের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ছিল তা'র কারণ—গ্রামে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সামাজিক সম্বন্ধ সেটা সত্য হ'তে পারে। শহরে তা সম্ভব নয়। অতএব সামাজিক মানুষ আশ্রয় পায় গ্রামে। আর সামাজিক মানুষের জন্যই তো সব। ধর্ম্মকর্ম্ম সামাজিক মানুষেরই জন্য। লক্ষপতি ক্রোড়-পতি টাকার থলি নিয়ে গদীয়ান হ'য়ে ব'সে থাক্‌তে পারে। বড়ো বড়ো হিসাবের খাতা ছাড়া তা'র আর কিছু নেই, তা'র সঙ্গে কারও সম্বন্ধ নেই। আপনার টাকার গড়খাই ক'রে তা'র মধ্যে সে ব'সে আছে, সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে তা'র সম্বন্ধ কোথায়?

এখনকার সঙ্গে তুলনা ক'র্‌লে অনেক অভাব আমাদের দেশে ছিল। এখন আমরা কলের জল খাই, তাতে রোগের বীজ কম, ভালো ডাক্তার পাই, ডাক্তার-

খানা আছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে অনেক সুযোগ ঘ'টেচে। আমি তাকে অসম্মান করিনে, কিন্তু আমাদের খুব একটা বড়ো সম্পদ ছিল সে হ'চ্চে আত্মীয়তা। এর চেয়ে বড়ো সম্পদ নেই। এই আত্মীয়তার যেখানে অভাব সেখানে সুখ-শান্তি থাক্‌তে পারে না।

সমস্ত পশ্চিম মহাদেশে মানুষে মানুষে আত্মীয়তা অত্যন্ত ভাসা-ভাসা; তা'র গভীর শিকড় নেই সকলে ব'ল্‌চে—আমি ভোগ ক'র্‌বো, আমি বড়ো হবো, আমার নাম হবে, আমার মুনফা হবে। যে তা ক'র্‌চে তা'র কত বড়ো সম্মান। তা'র ধনশক্তির পরিমাপ ক'র্‌তে গিয়ে সেখানকার লোকের মন রোমাঞ্চিত হ'য়ে ওঠে। ব্যক্তিগত শক্তির এই রকম উপাসনা এমন ভাবে আমাদের দেশে দেখিনি। কিছু না—একটা লোক শুধু ঘুষি চালাতে পারে। সে ঘুষির বড়ো ওস্তাদ রাস্তা দিয়ে বের'লো, রাস্তায় ভিড় জ'মে গেল। খবর এলো সিনেমার নটী লণ্ডনের রাস্তা দিয়ে গাড়ি ক'রে আস্‌চে, গাড়ির ভিতর থেকে চকিতে তাকে দেখ্‌বে ব'লে জনতায় রাস্তা নিরেট হ'য়ে উঠ্‌লো। আমাদের দেশে মহদাশয় যাঁকে বলি তিনি এলে আমরা সকলে তাঁর চরণ ধূলো নেবো। মহাত্মা গান্ধী

যদি আসেন দেশসুদ্ধ লোক ক্ষেপে যাবে। তাঁর না আছে অর্থ, না আছে বাহুবল, কিন্তু আছে হৃদয়, আছে আধ্যাত্মিক শক্তি। আমি যতদূর জানি তিনি ঘুষি মার্‌তে জানেন না, কিন্তু মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধকে তিনি বড়ো ক'রে স্বীকার ক'রেচেন, আপনাকে তিনি স্বতন্ত্র ক'রে রাখেন নি, তিনি আমাদের সকলের, আমরা সকলে তাঁর। বাস্, হ'য়ে গেল, এর চেয়ে বেশি আমরা কিছু বুঝিনে। তাঁর চেয়ে অনেক বিদ্বান অনেক জ্ঞানী অনেক ধনী আছে, কিন্তু আমাদের দেশ দেখ্‌বে—আত্মদানের ঐশ্বর্য্য।

এ কি কম কথা। এর থেকে বুঝি, আমাদের দেশের লোক কী চায়। পাণ্ডিত্য নয়, ঐশ্বর্য্য নয়, আর কিছু নয়, চায় মানুষের আত্মার সম্পদ। কিন্তু দিনে দিনে পরিবর্ত্তন হ'য়ে এসেচে। আমি গ্রামে অনেক দিন কাটিয়েচি, কোনো রকম চাটুবাক্য ব'ল্‌তে চাইনে। গ্রামের যে মূর্ত্তি দেখেচি সে অতি কুৎসিত। পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষ, ছলনা, বঞ্চনা বিচিত্র আকারে প্রকাশ পায়। মিথ্যা মকদ্দমার সাংঘাতিক জালে পরস্পরকে জড়িয়ে মারে। সেখানে দুর্নীতি কতদূর শিকড় গেড়েচে তা চক্ষে দেখেচি। সহরে

কতকগুলি সুবিধা আছে গ্রামে তা নেই, গ্রামের যেটা আপন জিনিষ ছিল তাও আজ সে হারিয়েচে।

মনের মধ্যে উৎকণ্ঠা নিয়ে আজ এসেচি গ্রামবাসী তোমাদের কাছে। পূর্ব্বে তোমরা সমাজবন্ধনে এক ছিলে, আজ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হ'য়ে পরস্পরকে কেবল আঘাত ক'র্‌চো। আর একবার সম্মিলিত হ'য়ে তোমাদের শক্তিকে জাগিয়ে তুল্‌তে হবে। বাহিরের আনুকূল্যের অপেক্ষা ক'রো না। শক্তি তোমাদের মধ্যে আছে জেনেই সেই শক্তির আত্মবিস্মৃতি আমরা ঘোচাতে ইচ্ছা ক'রেচি। কেননা, তোমাদের সেই শক্তির উপর সমস্ত দেশের দাবী আছে। ভিৎ যতই যাচ্চে ধ্ব'সে, উপরের তলায় ফাটল ধ'রেচে—বাইরে থেকে পলস্তারা দিয়ে বেশি দিন তাকে বাঁচিয়ে রাখা চ'ল্‌বে না।

এসো তোমরা, প্রার্থীভাবে নয়, কৃতীভাবে। আমাদের সহযোগী হও তাহ'লেই সার্থক হবে আমাদের এই উদ্যোগ। গ্রামের সামাজিক প্রাণ সুস্থ হ'য়ে সবল হ'য়ে উঠুক। গানে গীতে কাব্যে কথায় অনুষ্ঠানে আনন্দে শিক্ষায় দীক্ষায় চিত্ত জাগুক্‌। তোমাদের দৈন্য দুর্ব্বলতা আত্মাবমাননা ভারতবর্ষের বুকের উপর

প্রকাণ্ড বোঝা হ'য়ে চেপে র'য়েচে। আর সকল দেশ এগিয়ে চ'লেচে, আমরা অজ্ঞানে অশিক্ষায় স্থাবর হ'য়ে প'ড়ে আছি। এ সমস্তই দূর হ'য়ে যাবে যদি নিজেব নিজের শক্তি সম্বলকে সমবেত ক'র্‌তে পারি। আমাদের এই শ্রীনিকেতনে জনসাধারণের সেই শক্তি-সমবায়ের সাধনা।

পায়োনিয়র ছাত্রদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ

পল্লীসেবা *

বেদে অনন্ত স্বরূপকে ব'লেচেন "আবিঃ", প্রকাশ-স্বরূপ। তাঁর প্রকাশ আপনার মধ্যেই সম্পূর্ণ। তাঁর কাছে মানুষের প্রার্থনা এই যে, "আবিরাবীর্ম্ম এধি।" হে আবি, আমার মধ্যে তোমার আবির্ভাব হোক্। অর্থাৎ আমার আত্মায় অনন্তস্বরূপের প্রকাশ চাই। জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে আমার অভিব্যক্তি অনন্তের পরিচয় দেবে এতেই আমার সার্থকতা। আমাদের চিত্তবৃত্তি থেকে, ইচ্ছাশক্তি থেকে, কর্ম্মোদ্যম থেকে অপূর্ণতার আবরণ ক্রমে ক্রমে মোচন ক'রে অনন্তের সঙ্গে নিজের সাধর্ম্ম্য প্রমাণ ক'র্‌তে থাক্‌বো এই হ'চ্চে মানুষের ধর্ম্মসাধনা।

অন্য জীবজন্তু যেমন অবস্থায় সংসারে এসেচে সেই অবস্থাতেই তাদের পরিণাম। অর্থাৎ প্রকৃতিই তাদের প্রকাশ ক'রেচে এবং সেই প্রকৃতির প্রবর্ত্তনা মেনেই

* শ্রীনিকেতন উৎসবে প্রদত্ত অভিভাষণ

তা'রা প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তা'র বেশি কিছু নয়। কিন্তু নিজের ভিতর থেকে নিজের অন্তরতর সত্যকে নিরন্তর উদ্‌ঘাটিত ক'র্‌তে হবে নিজের উদ্যমে,—মানুষের এই চরম অধ্যবসায়। সেই আত্মোপলব্ধ সত্যেই তা'র প্রকাশ, প্রকৃতিনিয়ন্ত্রিত প্রাণযাত্রায় নয়। তাই তা'র দুরূহ প্রার্থনা এই যে, সকল দিকেই অনন্তকে যেন প্রকাশ করি। তাই সে বলে ভূমৈব সুখং, মহত্ত্বেই সুখ, নাল্পে সুখমস্তি, অল্পকিছুতেই সুখ নেই।

মানুষের পক্ষে তাই সকলের চেয়ে দুর্গতি যখন আপনার জীবনে সে আপন অন্তর্নিহিত ভূমাকে প্রকাশ ক'র্‌তে পার্‌লে না—বাধাগুলো শক্ত হ'য়ে রইলো। এই তা'র পক্ষে মৃত্যুর চেয়ে বড়ো মৃত্যু। আহারে বিহারে ভোগে বিলাসে সে পরিপুষ্ট হ'তে পারে, কিন্তু জ্ঞানের দীপ্তিতে ত্যাগের শক্তিতে প্রেমের বিস্তারে কর্ম্মচেষ্টার সাহসে সে যদি আপনার প্রবুদ্ধ মুক্তস্বরূপ কিছু পরিমাণেও প্রকাশ ক'র্‌তে না পারে তবে তাকেই বলে মহতী বিনষ্টিঃ—সে বিনষ্টি জীবের মৃত্যুতে নয়, আত্মার অপ্রকাশে।

সভ্যতা যাকে বলি তা'র এক প্রতিশব্দ হ'চ্চে ভূমাকে প্রকাশ। মানুষের ভিতরকার যে নিহিতার্থ, যা তা'র

গভীর সত্য, সভ্যতায় তা'রই আবিষ্কার চ'ল্‌চে। সভ্য মানুষের শিক্ষাবিধি এত ব্যাপক, এত দুরূহ এই জন্যেই। তা'র সীমা কেবলই অগ্রসর হ'য়ে চ'লেচে, সভ্য মানুষের চেষ্টা প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট কোনো গণ্ডীকে চরম ব'ল্‌তে চাচ্চে না।

মানুষের মধ্যে নিত্যপ্রসার্য্যমান সম্পূর্ণতার যে আকাঙ্ক্ষা তা'র দুটো দিক, কিন্তু তা'রা পরস্পর যুক্ত। একটা ব্যক্তিগত পূর্ণতা আর একটা সামাজিক, এদের মাঝখানে ভেদ নেই। ব্যক্তিগত উৎকর্ষের ঐকান্তিকতা অসম্ভব। মানবলোকে যাঁরা শ্রেষ্ঠ পদবী পেয়েচেন তাঁদের শক্তি সকলের শক্তির ভিতর দিয়েই ব্যক্ত, তা পরিচ্ছিন্ন নয়। মানুষ যেখানে ব্যক্তিগতভাবে বিচ্ছিন্ন, পরস্পরের সহযোগিতা যেখানে নিবিড় নয় সেইখানেই বর্ব্বরতা। বর্ব্বর একা একা শিকার করে, খণ্ড খণ্ডভাবে জীবিকার উপযুক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, সেই জীবিকার ভোগ অত্যন্ত ছোটো সীমার মধ্যে। বহুজনের চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষসহযোগে নিজের চিত্তের উৎকর্ষ, বহুজনের শক্তিকে সংযুক্ত ক'রে নিজের শক্তি, বহুজনের সম্পদকে সম্মিলিত করার দ্বারা নিজের সম্পদ সুপ্রতিষ্ঠিত করাই হ'লো সভ্য মানবের লক্ষ্য।

উপনিষৎ বলেন, আমরা যখন আপনার মধ্যে অন্যকে ও অন্যের মধ্যে আপনাকে পাই তখনই সত্যকে পাই—ন ততো বিজুগুপ্সতে—তখন আর গোপনে থাক্‌তে পারিনে, তখনই আমাদের প্রকাশ। সভ্যতায় মানুষ প্রকাশমান, বর্ব্বরতায় মানুষ অপ্রকাশিত। পরস্পরের মধ্যে পরস্পরে আত্মোপলব্ধি যতই সত্য হ'তে থাকে ততই সভ্যতার যথার্থ স্বরূপ পরিস্ফুট হয়। ধর্ম্মের নামে, কর্ম্মের নামে, বৈষয়িকতার নামে, স্বাদেশিকতার নামে, যেখানেই মানুষ মানবলোকে ভেদ সৃষ্টি ক'রেচে সেইখানেই দুর্গতির কারণ গোচরে অগোচরে বল পেতে থাকে। সেখানে মানব আপন মানবধর্ম্মকে আঘাত করে, সেই হ'চ্চে আত্মঘাতের প্রকৃষ্ট পন্থা। ইতিহাসে যুগে যুগে তা'র প্রমাণ পাওয়া গেচে।

সভ্যতা-বিনাশের কারণ সন্ধান ক'র্‌লে একটি মাত্র কারণ পাওয়া যায় সে হ'চ্চে মানবসম্বন্ধের বিকৃতি বা ব্যাঘাত। যারা ক্ষমতাশালী ও যারা অক্ষম তাদের মধ্যেকার ব্যবধান প্রশস্ত হ'য়ে সেখানে সামাজিক সামঞ্জস্য নষ্ট হ'য়েচে। সেখানে প্রভুর দলে, দাসের দলে, ভোগীর দলে, অভুক্তের দলে সমাজকে দ্বিখণ্ডিত

ক'রে সমাজদেহে প্রাণপ্রবাহের সঞ্চরণকে অবরুদ্ধ ক'রেচে ;—তাতে এক অঙ্গের অতিপুষ্টি এবং অন্য অঙ্গের অতিশীর্ণতায় রোগের সৃষ্টি হ'য়েচে। পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই এই ছিদ্র দিয়ে আজ যমের চর আনাগোনা ক'র্‌চে। আমাদের দেশে তা'র প্রবেশ-পথ অন্য দেশের চেয়ে আরও যেন অবারিত। এই দুর্ঘটনা সম্প্রতি ঘ'টেচে।

একদিন আমাদের দেশে পল্লীসমাজ সজীব ছিল। এই সমাজের ভিতর দিয়েই ছিল সমস্ত দেশের যোগ-বন্ধন, আমাদের সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা ধর্ম্মকর্ম্মের প্রবাহ পল্লীতে পল্লীতে ছিল সঞ্চারিত। দেশের বিরাট চিত্ত পল্লীতে পল্লীতে প্রসারিত হ'য়ে আশ্রয় পেয়েচে, প্রাণ পেয়েচে। এ-কথা সত্য যে, আধুনিক অনেক জ্ঞান বিজ্ঞান সুযোগ সুবিধা থেকে আমরা বঞ্চিত ছিলুম। তখন আমাদের চেষ্টার পরিধি ছিল সঙ্কীর্ণ, বৈচিত্র্য ছিল স্বল্প, জীবনযাত্রার আয়োজনে উপকরণে অভাব ছিল বিস্তর। কিন্তু সামাজিক প্রাণ-ক্রিয়ার যোগ ছিল অবিচ্ছিন্ন। এখন তা নেই। নদীতে স্রোত যখন বহমান থাকে তখন সেই স্রোতের দ্বারাই এ-পারে ও-পারে এ-দেশে ও-দেশে আনাগোনা দেনা-পাওনার

যোগ রক্ষা হয়। জল যখন শুকিয়ে যায় তখন এই নদীরই খাত বিষম বিঘ্ন হ'য়ে ওঠে। তখন এক কালের পথটাই হয় অন্যকালের অপথ। বর্ত্তমানে তাই ঘ'টেচে।

যাদের আমরা ভদ্রসাধারণ নাম দিয়ে থাকি তা'রা যে বিদ্যালাভ করে, তাদের যা আকাঙ্ক্ষা ও সাধনা, তা'রা যে-সব সুযোগ সুবিধা ভোগ ক'রে থাকে সে সব হ'লো মরা নদীর শুষ্ক গহ্বরের এক পাড়িতে, তা'র অপর পাড়ির সঙ্গে জ্ঞান বিশ্বাস আচার অভ্যাস দৈনিক জীবনযাত্রায় দুস্তর দূরত্ব। গ্রামের লোকের না আছে বিদ্যা, না আছে আরোগ্য, না আছে সম্পদ, না আছে অন্নবস্ত্র। ওদিকে যারা কলেজে পড়ে, ওকালতী করে, ডাক্তারী করে, ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেয়, তা'রা র'য়েচে দ্বীপের মধ্যে, চারিদিকে অতলস্পর্শ বিচ্ছেদ।

যে-স্নায়ুজালের যোগে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বেদনা দেহের মর্ম্মস্থানে পৌঁছয়, সমস্ত দেহের আত্মবোধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বোধের সম্মিলনে সম্পূর্ণ হয়, তা'র মধ্যে যদি বিচ্ছিন্নতা ঘটে তবে তো মরণদশা। সেই দশা আমাদের সমাজে। দেশকে মুক্তিদান করবার জন্যে আজ যারা উৎকট অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত এমন সব লোকের মধ্যেও দেখা যায়

সমাজের মধ্যে গুরুতর ভেদ যেখানে, যেখানে পক্ষাঘাতের লক্ষণ, সেখানে তাঁদের দৃষ্টিই পড়ে না। থেকে থেকে ব'লে ওঠেন কিছু করা চাই, কিন্তু কণ্ঠের সঙ্গে সঙ্গে হাত এগোয় না। দেশ সম্বন্ধে আমাদের যে উদ্যোগ তা'র থেকে দেশের লোক বাদ পড়ে। এটা আমাদের এতই অভ্যস্ত হ'য়ে গেচে যে, এর বিপুল বিড়ম্বনা সম্বন্ধে আমাদের বোধ নেই। একটা তা'র দৃষ্টান্ত দিই।

আমাদের দেশে আধুনিক শিক্ষাবিধি ব'লে একটা পদার্থের আবির্ভাব হ'য়েচে। তা'রই নামে স্কুল কলেজ ব্যাঙের ছাতার মতো ইতস্তত মাথা তুলে উঠেচে। এমন ভাবে এটা তৈরি যে, এর আলো কলেজি মণ্ডলের বাইরে অতি অল্পই পৌঁছয়—সূর্য্যের আলো চাঁদের আলোয় পরিণত হ'য়ে যতটুকু বিকীর্ণ হয় তা'র চেয়েও কম। বিদেশী ভাষার স্থূল বেড়া তা'র চারদিকে। মাতৃভাষার যোগে শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে যখন চিন্তা করি সে-চিন্তার সাহস অতি অল্প। সে যেন অন্তঃপুরিকা বধূর মতোই ভীরু। আঙিনা পর্য্যন্তই তা'র অধিকার, তা'র বাইরে চিবুক পেরিয়ে তা'র ঘোমটা নেমে পড়ে। মাতৃভাষার আমল

প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যেই, অর্থাৎ সে কেবল শিশুশিক্ষারই যোগ্য—অর্থাৎ মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা শেখ্‌বার সুযোগ নেই, সেই বিরাট জনসংঘকে বিদ্যার অধিকার সম্বন্ধে চির শিশুর মতোই গণ্য করা হ'য়েচে। তা'রা কোনোমতেই পূরো মানুষ হ'য়ে উঠ্‌বে না অথচ স্বরাজ সম্বন্ধে তা'রা পূরো মানুষের অধিকার লাভ ক'র্‌বে চোখ বুজে এইটে আমরা কল্পনা করি।

জ্ঞানলাভের ভাগ নিয়ে দেশের অধিকাংশ জনমণ্ডলী সম্বন্ধে এত বড়ো অনশনের ব্যবস্থা আর কোনো নবজাগ্রত দেশে নেই—জাপানে নেই, পারস্যে নেই, তুরস্কে নেই, ইজিপ্টে নেই। যেন মাতৃভাষা একটা অপরাধ, যাকে খৃষ্টান ধর্ম্মশাস্ত্রে বলে আদিম পাপ। দেশের লোকের পক্ষে মাতৃভাষাগত শিক্ষার ভিতর দিয়ে জ্ঞানের সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণতা আমরা কল্পনার বাইরে ফেলে রেখেচি। ইংরেজি হোটেলওয়ালার দোকান ছাড়া আর কোথাও দেশের লোকের পুষ্টিকর অন্ন মিলবেই না এমন কথা বলাও যা আর ইংরেজি ভাষা ছাড়া মাতৃভাষার যোগে জ্ঞানের সম্যক্ সাধনা হ'তেই পার্‌বে না এও বলা তাই।

এই উপলক্ষ্যে এ কথা মনে রাখা দরকার, যে, আধুনিক সমস্ত বিদ্যাকে জাপানী ভাষার সম্পূর্ণ আয়ত্তগম্য ক'রে তবে জাপানী বিশ্ববিদ্যালয় দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে সত্য ও সম্পূর্ণ ক'রে তুলেচে। তা'র কারণ, শিক্ষা ব'ল্‌তে জাপান সমস্ত দেশের শিক্ষা বুঝেচে—ভদ্রলোক ব'লে এক সঙ্কীর্ণ শ্রেণীর শিক্ষা বোঝেনি। মুখে আমরা যাই বলি, দেশ বল্‌তে আমরা যা বুঝি সে হ'চ্চে ভদ্রলোকের দেশ। জনসাধারণকে আমরা বলি ছোটো লোক, এই সংজ্ঞাটা বহুকাল থেকে আমাদের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ ক'রেচে। ছোটো লোকদের পক্ষে সকল প্রকার মাপকাঠিই ছোটো। তা'রা নিজেও সেটা স্বীকার ক'রে নিয়েচে। বড়ো মাপের কিছুই দাবী কর্‌বার ভরসা তাদের নেই। তা'রা ভদ্রলোকের ছায়াচর, তাদের প্রকাশ অনুজ্জ্বল, অথচ দেশের অধিকাংশই তা'রা, সুতরাং দেশের অন্তত বারো আনা অনালোকিত। ভদ্রসমাজ তাদের স্পষ্ট ক'রে দেখ্‌তেই পায় না, বিশ্বসমাজের তো কথাই নেই।

রাষ্ট্রীয় আলোচনার মত্ত অবস্থায় আমরা মুখে যাই-কিছু বলি না কেন, দেশাভিমান যত তারস্বরে প্রকাশ

করি না কেন—আমাদের দেশ প্রকাশহীন হ'য়ে আছে ব'লেই কর্ম্মের পথ দিয়ে দেশের সেবায় আমাদের এত ঔদাসীন্য। যাদের আমরা ছোটো ক'রে রেখেচি মানবস্বভাবের কৃপণতাবশত তাদের আমরা অবিচার ক'রেই থাকি। তাদের দোহাই দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে অর্থসংগ্রহ করি—কিন্তু তাদের ভাগে পড়ে বাক্য, অর্থটা অবশেষে আমাদের দলের লোকের ভাগ্যেই এসে জোটে। মোট কথাটা হ'চ্চে দেশের যে অতিক্ষুদ্র অংশে বুদ্ধি বিদ্যা ধন মান সেই শতকরা পাঁচ পরিমাণ লোকের সঙ্গে পঁচানব্বই পরিমাণ লোকের ব্যবধান মহাসমুদ্রের ব্যবধানের চেয়ে বেশি। আমরা এক দেশে আছি অথচ আমাদের এক দেশ নয়।

শিশুকালে আমাদের ঘরে যে সেজের দীপ জ্ব'ল্‌তো তা'র এক অংশে অল্প তেল অপর অংশে অনেকখানি জল ছিল। জলের অংশ ছিল নীচে, তেলের অংশ ছিল উপরে। আলো মিটমিট ক'রে জ্বল্‌তো, অনেক-খানি ছড়াতো ধোঁয়া। এটা কতকটা আমাদের সাবেক কালের অবস্থা। ভদ্রসাধারণ এবং ইতর-সাধারণের সম্বন্ধটা এই রকমই ছিল। তাদের মর্য্যাদা

সমান নয় কিন্তু তবুও তা'রা উভয়ে একত্র মিলে একই আলো জ্বালিয়ে রেখেছিলো। তাদের ছিল একটা অখণ্ড আধার। আজকের দিনে তেল গিয়েচে এক-দিকে, জল গিয়েচে আর একদিকে, তেলের দিকে আলোর উপাদান অতি সামান্য, জলের দিকে একে-বারেই নেই।

বয়স যখন হ'লো ঘরে এলো কেরোসিনের ল্যাম্প বিদেশ থেকে, তাতে সবটাতেই এক তেল, সেই তেলের সমস্তটার মধ্যেই উদ্দীপনের শক্তি। আলোর উজ্জ্বলতাও বেশি। এর সঙ্গে য়ুরোপীয় সভাসমাজের তুলনা করা যেতে পারে। সেখানে এক জাতেরই বিদ্যা ও শক্তি দেশের সকল লোকের মধ্যেই ব্যাপ্ত। সেখানে উপরিতল নিম্নতল আছে, সেই উপরিতলের কাছেই বাতি দীপ্ত হ'য়ে জ্বলে নীচের তল অদীপ্ত। কিন্তু সেই ভেদ অনেকটা আকস্মিক—সমস্ত তেলের মধ্যেই দীপ্তির শক্তি আছে। সে-হিসাবে জ্যোতির জাতিভেদ নেই—নীচের তেল যদি উপরে ওঠে তাহ'লে উজ্জ্বলতার তারতম্য ঘটে না। সেখানে নীচের দলের পক্ষে উপরের দলে উত্তীর্ণ হওয়া অসাধ্য নয়—সেই চেষ্টা নিয়তই চ'ল্‌চে।

আর এক শ্রেণীর বাতি আছে—তাকে বলি বিজ্‌লি বাতি। তা'র মধ্যে তারের কুণ্ডলী আলো দেয়, তা'র আগাগোড়াই সমান প্রদীপ্ত। তা'র মধ্যে দীপ্ত অদীপ্তের ভেদ নেই—এই আলো দিবালোকের প্রায় সমান। য়ুরোপীয় সমাজে এই বাতি জ্বালাবার উদ্যোগ সব দেশে এখন চ'ল্‌চে না—কিন্তু কোথাও কোথাও সুরু হ'য়েচে—এর যন্ত্রটাকে পাকা ক'রে তুল্‌তে হয়তো এখনও অনেক ভাঙচূর ক'র্‌তে হবে, যন্ত্রের মহাজন কেউ কেউ হয়তো দেউলে হ'য়ে যেতেও পারে—কিন্তু পশ্চিম মহাদেশে এইদিকে একটা ঝোঁক প'ড়েচে সে-কথা আর গোপন ক'রে রাখবার জো নেই। এইটে হ'চ্চে প্রকাশের চেষ্টা, মানুষের অন্তর্নিহিত ধর্ম্ম—এই ধর্ম্মসাধনায় সকল মানুষই অব্যাহত অধিকার লাভ ক'র্‌বে এই রকমের একটা প্রয়াস ক্রমশই যেন ছড়িয়ে প'ড়্‌চে।

কেবল আমাদের হতভাগ্য দেশে দেখি মাটির প্রদীপে যে আলো একদিন এখানে জ্ব'লেছিলো তাতেও আজ বাধা প'ড়্‌লো। আজ আমাদের দেশের ডিগ্রি-ধারীরা পল্লীর কথা যখন ভাবেন তখন তাদের জন্যে অতি সামান্য ওজনে কিছু করাকেই যথেষ্ট ব'লে মনে

করেন। যতক্ষণ আমাদের এই রকমের মনোভাব ততক্ষণ পল্লীর লোকেরা আমাদের পক্ষে বিদেশী। এমন কি, তা'র চেয়েও তা'রা বেশি পর, তা'র কারণ এই,—আমরা স্কুলে কলেজে যেটুকু বিদ্যা পাই সে বিদ্যা য়ুরোপীয়। সেই বিদ্যার সাহায্যে য়ুরোপীয়কে বোঝা ও য়ুরোপীয়ের কাছে নিজেকে বোঝানো আমাদের পক্ষে সহজ। ইংলণ্ড ফ্রান্স জার্ম্মানির চিত্তবৃত্তি আমাদের কাছে সহজে প্রকাশমান,—তাদের কাব্য গল্প নাটক যা আমরা পড়ি সে আমাদের কাছে হেঁয়ালি নয়—এমন কি, যে কামনা যে তপস্যা তাদের, আমাদের কামনা সাধনাও অনেক পরিমাণে তা'রই পথ নিয়েচে। কিন্তু যারা মা ষষ্ঠী মনসা ওলাবিবি শীতলা ঘেঁটু রাহু শনি ভূত প্রেত ব্রহ্মদৈত্য গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা পাণ্ডা পুরুতের আওতায় মানুষ হ'য়েচে তাদের থেকে আমরা খুব বেশি উপরে উঠেচি তা নয়, কিন্তু দূরে স'রে গিয়েচি, পরস্পরের মধ্যে ঠিকমতো সাড়া চলে না। তাদের ঠিকমতো পরিচয় নেবার উপযুক্ত কৌতূহল পর্য্যন্ত আমাদের নেই।

আমাদের কলেজে যারা ইকনমিক্‌স্‌, এথনোলজি পড়ে তা'রা অপেক্ষা ক'রে থাকে য়ুরোপীয় পণ্ডিতের—

পাশের গ্রামের লোকের আচার-বিচার বিধি-ব্যবস্থা জানবার জন্যে। ওরা ছোটো লোক, আমাদের মনে মানুষের প্রতি যেটুকু দরদ আছে তাতে ক'রে ওরা আমাদের কাছে দৃশ্যমান নয়। পশ্চিম মহাদেশের নানাপ্রকার "মূভ্‌মেণ্টের" পূর্ব্বাপর ইতিহাস এঁরা প'ড়েচেন,—আমাদের জনসাধারণদের মধ্যেও নানা মূভ্‌মেণ্ট চ'লে আস্‌চে, কিন্তু সে আমাদের শিক্ষিত-সাধারণের অগোচরে। জান্‌বার জন্যে কোনো ঔৎসুক্য নেই—কেননা তাতে পরীক্ষাপাসের মার্কা মেলে না। দেশের সাধারণের মধ্যে আউল বাউল কত সম্প্রদায় আছে, সেটা একেবারে অবজ্ঞার বিষয় নয়; ভদ্রসমাজের মধ্যে নূতন নূতন ধর্ম্মপ্রচেষ্টার চেয়ে তা'র মধ্যে অনেক বিষয়ে গভীরতা আছে,—সে সব সম্প্রদায়ের যে সাহিত্য তাও শ্রদ্ধা ক'রে রক্ষা কর্‌বার যোগ্য—কিন্তু ওরা ছোটো লোক।

সকল দেশেই নৃত্য কলাবিদ্যার অন্তর্গত,—ভাব-প্রকাশের উপায়রূপে শ্রদ্ধা পেয়ে থাকে। আমাদের দেশে ভদ্রসমাজে তা লোপ পেয়ে গেচে ব'লে আমরা ধ'রে রেখেচি সেটা আমাদের নেই। অথচ জন-সাধারণের নৃত্যকলা নানা আকারে এখনও আছে—

কিন্তু ওরা ছোটো লোক। অতএব ওদের যা আছে সেটা আমাদের নয়। এমন কি, সুন্দর সুনিপুণ হ'লেও সেটা আমাদের পক্ষে লজ্জার বিষয়। ক্রমে হয়তো এ সমস্তই লোপ হ'য়ে যাচ্চে—কিন্তু সেটাকে আমরা দেশের স্মৃতি ব'লেই গণ্য করি নে—কেননা বস্তুতই ওরা আমাদের দেশে নেই!

কবি ব'লেচেন, "নিজ বাসভূমে পরবাসী হ'লে।" তিনি এইভাবেই ব'লেছিলেন যে, আমরা বিদেশীর শাসনে আছি। তা'র চেয়ে সত্যতর গভীরতর ভাবে বলা চলে যে, আমাদের দেশে আমরা পরবাসী—অর্থাৎ আমাদের জাতের অধিকাংশের দেশ আমাদের দেশ নয়। সে-দেশ আমাদের অদৃশ্য অস্পৃশ্য। যখন দেশকে মা ব'লে আমরা গলা ছেড়ে ডাকি তখন মুখে যাই বলি মনে মনে জানি সে মা গুটিকয়েক আদুরে ছেলের মা। এই ক'রেই কি আমরা বাঁচবো? শুধু ভোট দেবার অধিকার পেয়েই আমাদের চরম পরিত্রাণ?

এই দুঃখেই দেশের লোকের গভীর ঔদাসীন্যের মাঝখানেই সকল লোকের আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হ'য়ে এখানে এই গ্রাম কয়টির মধ্যে আমরা প্রাণ উদ্বোধনের

যজ্ঞ ক'রেচি। যাঁরা কোনো কাজই করেন্ না তাঁরা অবজ্ঞার সঙ্গে জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে পারেন এতে কতটুকু কাজই বা হবে? স্বীকার ক'র্‌তেই হবে তেত্রিশ কোটির ভার নেবার যোগ্যতা আমাদের নেই। কিন্তু তাই ব'লে লজ্জা ক'র্‌বো না। কর্ম্মক্ষেত্রের পরিধি নিয়ে গৌরব ক'র্‌তে পার্‌বো এ কল্পনাও আমাদের মনে নেই কিন্তু তা'র সত্য নিয়ে যেন গৌরব ক'র্‌তে পারি। কখনও আমাদের সাধনায় যেন এ দৈন্য না থাকে যে, পল্লীর লোকের পক্ষে অতি অল্পটুকুই যথেষ্ট। ওদের জন্যে উচ্ছিষ্টের ব্যবস্থা ক'রে যেন ওদের অশ্রদ্ধা না করি। শ্রদ্ধয়া দেয়ং—পল্লীর কাছে আমাদের আত্মোৎসর্গের যে নৈবেদ্য তা'র মধ্যে শ্রদ্ধার যেন কোনো অভাব না থাকে।

৩

কোরীয় যুবকের রাষ্ট্রিক মত

কোরীয় যুবকটি সাধারণ জাপানীর চেয়ে মাথায় বড়ো। ইংরেজি সহজে বলেন, উচ্চারণে জড়তা নেই।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম, "কোরিয়ায় জাপানী রাষ্ট্রশাসন তোমার পছন্দ নয়?"

"না।"

"কেন? জাপানী আমলে তোমাদের দেশে পূর্ব্বে-কার চেয়ে কি ব্যবস্থা ভালো হয়নি?"

"তা হ'য়েচে, কিন্তু আমাদের যে দুঃখ সেটা সংক্ষেপে ব'ল্‌তে গেলে দাঁড়ায়—জাপানী রাজত্ব ধনিকের রাজত্ব। কোরিয়া তা'র মুনফার উপায়, তা'র ভোজ্যের ভাণ্ডার। প্রয়োজনের আসবাবকে মানুষ উজ্জ্বল ক'রে রাখে, কারণ সেটা তা'র আপন সম্পত্তি, তাকে নিয়ে তা'র অহমিকা। কিন্তু মানুষ তো থালা ঘটি বাটি কিম্বা গাড়োয়ানের ঘোড়া বা গোয়ালের গোরু নয় যে, বাহ্য যত্ন ক'র্‌লেই তা'র পক্ষে যথেষ্ট।"

"তুমি কি ব'ল্‌তে চাও, জাপান যদি কোরিয়ার সঙ্গে প্রধানত আর্থিক সম্বন্ধ না পাতিয়ে তোমাদের

'পরে রাজ-প্রতাপের সম্বন্ধ খাটাতো, অর্থাৎ বৈশ্যরাজ না হ'য়ে ক্ষত্রিয়রাজ হ'তো তাহ'লে তোমাদের পরিতাপের কারণ থাক্‌তো না ?"

"আর্থিক সম্বন্ধের যোগে বিরাট জাপানের সহস্রমুখী ক্ষুধা আমাদের শোষণ করে, কিন্তু রাজপ্রতাপের সম্বন্ধ ব্যক্তিগত, সীমাবদ্ধ ; তা'র বোঝা হাল্‌কা। রাজার ইচ্ছা কেবল যদি শাসনের ইচ্ছা হয় শোষণের ইচ্ছা না হয় তবে তাকে স্বীকার ক'রেও মোটের উপর সমস্ত দেশ আপন স্বাতন্ত্র্য ও আত্মসম্মান রাখ্‌তে পারে। কিন্তু ধনিকের শাসনে আমাদের গোটা দেশ আর-একটি গোটা দেশের পণ্যদ্রব্যে পরিণত। আমরা লোভের জিনিষ, আত্মীয়তার না, গৌরবের না।"

"এই যে কথাগুলি ভাব্‌চো এবং ব'ল্‌চো, এই যে সমষ্টিগতভাবে জাতীয় আত্মসম্মানের জন্যে তোমার আগ্রহ, তা'র কি কারণ এই নয় যে, জাপানের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে তোমরা আধুনিক যুগের রাষ্ট্রিক শিক্ষায় দীক্ষিত ?"

কোরীয় যুবক দ্বিধার ভাবে চুপ ক'রে রইলেন।

আমি ব'ল্‌লুম, "চেয়ে দেখো সামনে ঐ চীন দেশ। সেখানে স্বজাতীয় আত্মসম্মানবোধ শিক্ষার অভাবে

দেশের জন-সাধারণের মধ্যে অপ্রবুদ্ধ। তাই দেখি ব্যক্তিগত ক্ষমতা-প্রাপ্তির দুরাশায় সেখানে কয়েকজন লুব্ধ লোকের হানাহানি কাটাকাটির ঘূর্ণিপাক। এই নিয়ে লুটপাট অত্যাচারে ডাকাতের হাতে সৈনিকের হাতে হতভাগ্য দেশ ক্ষত-বিক্ষত, রক্তে প্লাবিত, অসহায়ভাবে দিন-রাত সন্ত্রস্ত। শিক্ষার জোরে যেখানে সাধারণ লোকের মধ্যে স্বাধিকার-বোধ স্পষ্ট না হ'য়েচে সেখানে স্বদেশী বা বিদেশী দুরাকাঙ্ক্ষীদের হাতে তাদের নির্য্যাতন ঠেকাবে কিসে? সে-অবস্থায় তা'রা ক্ষমতালোলুপের স্বার্থসাধনের উপকরণমাত্র হ'য়ে থাকে। তুমি তোমার দেশকে ধনীর উপকরণদশাগ্রস্ত ব'লে আক্ষেপ ক'রেছিলে, সেই পরের উপকরণদশা তাদের ক্ষা ছুঁতেই ঘোচে না যারা মূঢ়, যারা কাপুরুষ, ভাগ্যের মুখপ্রত্যাশী, যারা আত্ম-কর্ত্তৃত্বে আস্থাবান নয়। কোরিয়ার অবস্থা জানিনে, কিন্তু সেখানে নব-যুগের শিক্ষার প্রভাবে যদি সাধারণের মধ্যে স্বাধি-কারবোধের অঙ্কুরমাত্র উদ্গত হ'য়ে থাকে তবে সে শিক্ষা কি জাপানের কাছ থেকেই পাওনি?"

"কার কাছ থেকে পেয়েচি তাতে কী আসে যায়? শত্রু হোক, মিত্র হোক, যে-কেউ আমাদের যে উপায়ে

জাগিয়ে তুলুক না কেন, জাগরণের যা ধর্ম্ম তা'র তো কাজ চ'ল্‌বে।"

"সে কথা আমি মানি, সে তর্ক আমার নয়। বিচারের বিষয় এই যে, তোমার দেশে শিক্ষাবিস্তার এতটা হ'য়েচে কি না যাতে দেশের অধিকাংশ লোক স্বাধিকার উপলব্ধি এবং সেটা যথার্থভাবে দাবী ক'র্‌তে পারে। যদি তা না হ'য়ে থাকে তবে সেখানে বিদেশী নিরস্ত হ'লেও সর্ব্বসাধারণের যোগে আত্মশাসন ঘ'ট্‌বে না, ঘ'ট্‌বে কয়েকজনের দৌরাত্ম্যে আত্ম-বিপ্লব। এই স্বল্প লোকের ব্যক্তিগত স্বার্থবোধকে সংযত কর্‌বার একমাত্র উপায় বহু লোকের সমষ্টিগত স্বার্থবোধের উদ্বোধন।"

"যে-পরিমাণ ও যে-প্রকৃতির শিক্ষ [illegible] চা, [illegible] ভাবে সমস্ত দেশের চৈতন্য হ'তে পারে সেটা আমরা সম্পূর্ণ-ভাবে পরের হাত থেকে প্রত্যাশা ক'র্‌বো কেমন ক'রে?"

"তোমরা শিক্ষিত লোকেরা দেশে সেই শিক্ষার অভাব যদি অনুভব করো তবে এই শিক্ষাবিস্তানের সাধনাকেই সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্যরূপে নিজেরাই গ্রহণ ক'রবে না কে.. . দেশকে বাঁচাতে

গেলে কেবল তো ভাবুকতা নয়, জ্ঞানের প্রয়োজন করে। আমার মনে আরো একটি চিন্তার বিষয় আছে। ভৌগোলিক ঐতিহাসিক বা জাতীয় প্রকৃতি-গত কারণে কোরিয়া অনেক কাল থেকেই দুর্ব্বল। আজকের দিনে যুদ্ধবিগ্রহ যখন বৈজ্ঞানিক সাধনাসাধ্য ও প্রভূত ব্যয়সাধ্য তখন জাপান হ'তে নিজের শক্তিতে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে তোমরা নিজের শক্তিতেই কি আত্মরক্ষা ক'র্‌তে পারো? ঠিক ক'রে বলো।"

"পারিনে সে-কথা স্বীকার ক'র্‌তেই হবে।"

"যদি না পারো তবে এ-কথাও মান্‌তে হবে যে, দুর্ব্বল কেবল নিজের বিপদ নয়, অন্যেরও বিপদ ঘটায়। দুর্ব্বলতার গহ্বর-কেন্দ্রে প্রবলের দুরা-কাঙ্ক্ষা ·নিই দূর থেকে আকৃষ্ট হ'য়ে আবর্ত্তিত হ'তে থাকে। সওয়ার সিংহের পিঠে চড়ে না, ঘোড়াকেই লাগামে বাঁধে। মনে করো রাশিয়া যদি কোরিয়ায় ধ্বজা গেড়ে বসে তবে সেটা কেবল কোরিয়ার পক্ষে নয় জাপানের পক্ষেও বিপদ। এমন অবস্থায় অন্য প্রবলকে ঠেকাবার জন্যই কোরিয়ায় জাপানের নিজের-শক্তিকেই প্রবল ক'র্‌তে হয়। এমন অবস্থায় কোনো একদিন জাপান বিনা পরাভবেই

কোরিয়ার ক্ষীণ হস্তেই কোরিয়ার ভাগ্যকে সমর্পণ ক'র্‌বে এ সম্ভবপর নয়। এর মধ্যে জাপানের শুধু মুনফার লোভ না, প্রাণের দায়।"

"আপনার প্রশ্ন এই যে, তাহ'লে কোরিয়ার উপায় কী। জানি, আধুনিক যুদ্ধের উপযোগী সৈন্যদল বানিয়ে তুলতে পার্‌বো না। তা'র পরে যুদ্ধের জন্য ভাসান্ জাহাজ, ডুব জাহাজ, উড়ো জাহাজ, এ সমস্ত তৈরি করা, চালনা করা বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের কল্পনার অতীত। সেই উদ্দেশে চেষ্টা করাও বিদেশী শাসনাধীনে অসম্ভব। তবু তাই ব'লে হাল ছেড়ে দেবো এ-কথা ব'ল্‌তে পারিনে।"

"এ-কথা বলা ভালোও না। হাল ছাড়্‌বো না, কিন্তু কোন্ দিক বাগে হাল চালাতে হবে সেটা যদি না ভাবি ও বুদ্ধিসঙ্গত তা'র একটা জবাব না দিই তবে মুখে যতই আস্ফালন করি ভাষান্তরে তাকেই বলে হাল ছেড়ে দেওয়া।"

"আমি কী ভাবি তা বলা যাক্। এমন একটা সময় আস্‌বে যখন পৃথিবীতে জাপানী, চীনীয়, রুশীয়, কোরীয় প্রভৃতি নানাজাতির মধ্যে আর্থিক স্বার্থগত রাষ্ট্রীয় প্রতিযোগিতাই সব চেয়ে প্রধান ঐতিহাসিক

ঘটনারূপে থাক্‌বে না। কেন থাক্‌বে না তা বলি। যে-দেশের মানুষকে চলিত ভাষায় স্বাধীন ব'লে থাকে তাদেরও ঐশ্বর্য্য এবং প্রতাপের ক্ষেত্রে তুই ভাগ। এক ভাগের অল্প লোকে ঐশ্বর্য্য ভোগ করে, আর এক ভাগের অসংখ্য তুর্ভাগা সেই ঐশ্বর্য্যের ভার বয়; এক ভাগের তু-চারজন লোক প্রতাপ-যজ্ঞশিখা নিজের ইচ্ছায় উদ্দীপিত করে, আর-এক ভাগের বিস্তর লোক ইচ্ছা না থাক্‌লেও নিজের অস্থি-মাংস দিয়ে সেই প্রতাপের ইন্ধন জোগায়। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যুগে যুগে মানুষের মধ্যে এই মূলগত বিভাগ, এই তুই স্তর। এতদিন নিম্নস্তরের মানুষ নিজের নিম্নতা নতশিরেই মেনে নিয়েচে, ভাবতেই পারেনি যে এটা অবশ্য-স্বীকার্য্য নয়।"

আমি ব'ল্‌লুম, "ভাবতে আরম্ভ ক'রেচে কেননা আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য মহাদেশে নিম্নস্তরের মধ্যে শিক্ষা পরিব্যাপ্ত।"

"তাই ধ'রে নিচ্চি। কারণ যাই হোক, আজ পৃথিবীতে যে যুগান্তকারী দ্বন্দ্বের সূচনা হ'য়েচে সে ভিন্ন ভিন্ন মহাজাতির মধ্যে নয়, মানুষের এই তুই বিভাগের মধ্যে, শাসয়িতা এবং শাসিত; শোষয়িতা

এবং শুষ্ক। এখানে কোরীয় এবং জাপানী, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য এক পংক্তিতেই মেলে। আমাদের দুঃখই আমাদের দৈন্যই আমাদের মহাশক্তি। সেই-টেতেই জগৎ জুড়ে আমাদের সম্মিলন এবং সেইটেতেই ভবিষ্যৎকে আমরা অধিকার ক'র্‌বো। অথচ যারা ধনিক তা'রা কিছুতেই একত্র মিলতে পারে না, স্বার্থের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরে তা'রা বিচ্ছিন্ন। আমাদের মস্ত আশ্বাসের কথা এই যে, যারা সত্য ক'রে মিল্‌তে পারে তাদেরই জয়। য়ুরোপে যে মহাযুদ্ধ হ'য়ে গেচে সেটা ধনিকের যুদ্ধ। সেই যুদ্ধের বীজ আজ অসংখ্য পরিমাণে পৃথিবীতে ছড়িয়ে রইলো। সেই বীজ মানব-প্রকৃতির মধ্যেই, স্বার্থ ই বিদ্বেষ-বুদ্ধির জন্মভূমি, পালন-দোলা। এতকাল দুঃখীরাই দৈন্যদ্বারা অজ্ঞানের দ্বারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিল, ধনের মধ্যে যে-শক্তিশেল আছে তাই দিয়েই তাদের মর্ম্ম বিদ্ধ হ'য়েচে। আজ দুঃখদৈন্যেই আমরা মিলিত হবো আর ধনের দ্বারাই ধনী হবে বিচ্ছিন্ন। পৃথিবীতে আজ রাষ্ট্রতন্ত্রে যে অশান্ত আলোড়ন, বলশালী জাতির মধ্যে যে দুরন্ত আশঙ্কা তাতে এইটেই কি দেখ্‌তে পাচ্চিনে?"

এর পরে আমাদের আর কথা ক'বার অবকাশ

হয়নি। আমি মনে মনে ভাবলুম অসংযত শক্তিলুব্ধতা নিজের মধ্যে বিষ উৎপাদন ক'রেই নিজেকে মারে এ কথা সত্য, কিন্তু শক্ত ও অশক্তের ভেদ আজ যে-একটা বিশেষ আকার ধ'রে প্রকাশ পাচ্চে সেইটেকে রক্তপাত ক'রে বিনাশ ক'র্‌লেই কি মানব-প্রকৃতি থেকে ভেদের মূল একেবারে চ'লে যায়? পৃথিবীর সমস্ত উচ্চভূমি ঝড়বৃষ্টির ঝাঁটার তাড়নায় ক্ষয় পেয়ে পেয়ে একদিন সমুদ্রের গর্ভে তলিয়ে যাবে এমন কথা শোনা যায়, কিন্তু সেইদিনেই কি পৃথিবীর মর্‌বার সময় আস্‌বে না? সমত্ব এবং পঞ্চত্ব কি একই কথা নয়? ভেদ নষ্ট ক'রে মানব-সমাজের সত্য নষ্ট করা হয়। ভেদের মধ্যে কল্যাণ সম্বন্ধ স্থাপনই তা'র নিত্য সাধনা, আর ভেদের মধ্যকার অন্যায়ের সঙ্গেই তা'র নিত্য সংগ্রাম। এই সাধনায় এই সংগ্রামেই মানুষ বড়ো হ'য়ে ওঠে। য়ুরোপ আজ সাধনাকে বাদ দিয়ে সংগ্রামকেই যখন একান্ত ক'র্‌তে চায় তখন তা'র চেষ্টা হয় শক্তকে বিনাশ ক'রে অশক্তকে সাম্য দেওয়া। যদি অভিলাষ সফল হয় তবে যে-হিংসার সাহায্যে সফল হবে সেই রক্তবীজকেই জয়ডঙ্কা বাজিয়ে সেই সফলতার কাঁধের উপর চড়িয়ে দেবে। কেবলি চ'ল্‌তে

থাকবে রক্তপাতের চক্রাবর্ত্তন। শান্তির দোহাই পেড়ে এরা লড়াই করে এবং সেই লড়াইএর ধাক্কাতেই সেই শান্তিকে মারে, আজকের দিনের শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রে কালকের দিনের যে-শক্তিকে জাগিয়ে তোলে আবার তারি বিরুদ্ধে পর-দিন থেকে যুদ্ধের আয়োজন ক'রতে থাকে। অবশেষে চরমশান্তি কি বিশ্বব্যাপী শ্মশানক্ষেত্রে ?

কোরীয় যুবকের সঙ্গে আমার যে-কথাবার্ত্তা হ'য়েছিলো তা'র ভাবখানা এই লেখায় আছে। এটা যথাযথ অনুলিপি নয়।